বাসুদেব বসু

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৩৫৮
প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯
প্রচ্ছদ শিল্পী
শ্রীগণেশ বসু
৫৯৬ সারকুলার রোড
হাওড়া-৪
ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট,
কলকাতা-৯
মুদ্রক :
শ্রীরণজিৎকুমার মণ্ডল
লক্ষ্মীজনার্দন প্রেস
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলকাতা-৬ ।

উৎসর্গ

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য

শ্রদ্ধাভাজনেষু

নদীর নাম মহানদী

লেখকের অন্য বই ।

নেফা সুন্দরী নেফা
নেফার অরণ্য
কাঁদিছে মৃত্তিকা
রাজগৃহে রাজা নেই
আলাপ থেকে প্রলাপ ( হাসির বই )
রহস্য নিজেই যখন দিশেহারা
ভয়াল অরণ্যটা হতবাক
নেফা রহস্যময়ী নেফা ( নাটিকা )

১

প্রাসাদোত্তম ভগ্ন অট্টালিকার একটা ঘরে বসে অর্জুন বহিধর আমাকে কোণারকের গল্প শোনাচ্ছিলো। প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগে ওড়িষ্যার ছাব্বিশটি রাজ্যের ভেতর বামরা আর তারই রাজধানী ওই দেওগড়। বহিধর চুমুকে চুমুকে মদ্যপান করছিলো। বিকেলের দিকে প্রচণ্ড ধূলোর ঝড় উঠেছিলো। বাইরে থেকে থেকে মেঘ গর্জন। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের ঝিলিক। মনেমনে ভাবছিলাম—যাক্। প্রচণ্ড খরার পর কয়েকপশলা বৃষ্টি হলে লোকগুলো বেঁচে যাবে' বেঁচে যাবে মাটি আর প্রান্তর। বললাম—বহিধরবাবু। সে রাতে কোণারক পরিদর্শন কালে আপনি অসম্ভব মদ্যপান করেছিলেন। আর তার জন্যে আপনি অনায়াসে ফিরে গিয়েছিলেন অনেক বছর পেছনে।

কোণারকের প্রাচীরগাত্রের সুন্দরীরা সজীব সচল হয়েআপনাকেনানা-রকম চমকপ্রদ গল্প শুনিয়েছিলো। শব্দ-টব্দ যা শুনেছিলেন বা যাদের দেখেছিলেন বলে মনে করছেন তারা আপনার নিজ মস্তিষ্কের নিছক কল্পনা রূপ গ্রহণ করে চারদিকে ঘুরে বেড়িয়েছে। বলুন দেখি মাল দিশি না বিলিতী ছিলো!

হা হা করে হেসে ওঠে বহিধর। সে হাসি বদ্ধদেয়ালে ঘা খেয়ে প্রতি-ধ্বনি তোলে। বহিধর বলে—মদ সম্বন্ধে আমি সার্টিফিকেট দিতে পারি। খাঁটি জিনিস ছিলো। তবে ওর সঙ্গে কিছু মিশিয়েছিলো কিনা সে সম্বন্ধে সার্টিফিকেট দিতে পারবো না। আপনি জানতে চেয়ে-ছিলেন সম্বলপুরে বর্তমান কালে খোঁজ করলে ডায়মণ্ড পাওয়া যাবে কিনা। আর সেজন্যে ডায়মণ্ড সম্বন্ধীয় একটা গল্প আপনাকে শোনাতে হয়েছিল।

—আপনি আমাকে বলেছিলেন সম্বলপুরে এক সময় প্রচুর ডায়মণ্ড

পাওয়া যেতো। আর সে জন্যেই আমার অতো কৌতূহল।

—পাওয়া তো যেতোই। আর এখনো কোনো কোনো বধিষ্ণু ঘরে খোঁজ করলে একটা দুটো বের হতে পারে। সে রাতে হতে পারে হয়তো আমার পুরো হুঁশ ছিল না কিন্তু ডায়মণ্ড কাহিনীটি নেহাত বাজে বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। ডায়মণ্ড সম্বন্ধে দুচারটি কথা আপনাকে আজ রাতে আমি বলবো কিন্তু তার আগে দু-একটা কাজ সেরেআসি। ঘরের দরজা খুলে বহ্নিধর বারান্দাধরে অন্ধকারের ভেতর অদৃশ্য হয়। অর্জুন বহ্নিধর কোণারক সম্বন্ধে যে গল্প বলেছিল সে সম্বন্ধে আমিপরেবিস্তারিতবলবো। বাইরেএলোমেলো হাওয়া। মাঝে মাঝেই বিদ্যুতের ঝিলিক। কোথায় যেন বাজ পড়লো।

এ বিরাট পরিত্যক্ত প্রাসাদে কে যেন ককিয়ে ককিয়ে কাঁদছে। মনে হয় নারী কণ্ঠের ক্রন্দন। শরীরটা কেমন ছম ছম করে। অশরীরীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনোদিনই বিশ্বাস করি নি। আজ নিজেকে কেমন অসহায় মনে হয়। নিজের ওপর ক্রমশঃ বিশ্বাসও হারাচ্ছি।

বহ্নিধর ফিরে আসে। সঙ্কোচের সঙ্গে প্রশ্ন করি—ও কিসের শব্দ ?

—কেউ কাঁদছে বোধ করি। নির্বিকার কণ্ঠে বহ্নিধর উত্তর দেয়।

—কাঁদছে যে তা দুজনেই শুনতে পাচ্ছি। স্ত্রীলোকের ক্রন্দন। কিন্তু কেন কাঁদছে ? প্রশ্ন করি বহ্নিধর বাবুকে।

—ও অনুশোচনার ক্রন্দন। বেশ সহজভাবে বহ্নিধর বলে।

—কিন্তু কাঁদছে কেন ?

—স্বামীর ওপর প্রতিশোধ নেবার বাসনায় সতীনের দুটি সন্তানকে জলে ডুবিয়ে মেরেছিল। মেয়েটা তারপর নিজে আত্মহত্যা করেছে। তাই বোধ করি এ অনুশোচনা। ওর অতৃপ্ত ক্ষুব্ধ আত্মা কেঁদে কেঁদে বেড়ায়। প্রাসাদের বদনাম রয়েছে বৈকি।

—তা হলে বলতে চাইছেন ভৌতিক ব্যাপার।

—তা নয় তো কি। জবাব দেয় বহ্নিধর বাবু।

—মেয়েটি কে ?

—এ প্রাসাদের চৌকিদারের স্ত্রী। কৃতকার্যের অনুশোচনায় জ্বলে পুড়ে খাক হচ্ছে।

—চৌকিদার কি এখনো এখানে রয়েছে?

—না। দুটো বউ-এর ভেতর যে বউটা বেঁচে ছিল তাকে মেরে নিজে মরেছে।

—বহিধরবাবু আপনি আমাকে এখানে নিয়ে এসে ভালো করেন নি। এসব কথা আগে জানালে আমি কখনো এখানে আসতাম না। এ রকম ঝড় বৃষ্টির বাদলার রাত!

হা হা করে সজোরে হেসে ওঠে বহিধরবাবু। নির্জন প্রাসাদে সে হাসি প্রতিধ্বনি তোলে। আমি ভয়ে কেঁপে উঠি। গোয়ার্তুমি করে এখানে চলে আসার জন্যে নিজেকে নিজে দায়ী করি! নিজের ওপর যথেষ্ট রাগ হয়। না এলেই বোধ করি ভালো হতো।

সন্ধ্যের পর থেকেই কেমন যেন একটা অস্বোয়াস্তির ভাব বোধ করছি। অর্জুন বহিধর মাইফেলের আভাস দিয়েছিল। বাঈজী আর তার সাথী সঙ্গীরা কোনো এক জায়গায় যানবাহন না যোগাড় করতে পেরে আটকা পড়েছে। ঠিক সময়মতো এসে পৌঁছুতে পারে নি। তবে বহিধরের কাছে খবর পৌছে গেছে। রাত দেড়টা দুটোর ভেতর ঠিক পৌছে যাবে।

উড়িষ্যার দেওগড়ের বিরাট প্রাসাদের ভেতর রাতের অন্ধকারে বসে আশেপাশে ফিসফাস সব ধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলাম। বাইরে ঢাউস ঢাউস গাছগুলো এক একটা প্রেতাত্মার মতো একে অন্যের ওপর আছড়ে পড়ছিল। ক্ষণে ক্ষণে-ই বিদ্যুতের ঝলকানি।

বিকেলের দিকে পাহাড়ী ঢালু পথ বেয়ে উঠে এসেছিলাম। সন্ধ্যার ছায়া গাঢ় হয়ে নেমে এসেছিল বনে প্রান্তরে। স্থল জল অন্তরীক্ষে। ঘনায়মান অন্ধকারে ক্রমশঃ বিলীন হচ্ছিল পাহাড়ের চূড়ো। আমাদের পথপ্রদর্শক লোকটার এক মুখ দাড়ি গোঁফ। মাথায় বাবরি চুল। গোঁফ সমাচ্ছন্ন একটা বিরাট মুখ! পরণে কালো ট্রাউজার। হাতকাটা গেঞ্জী। লোকটা

পায়ে পায়ে হেঁটে এসেছিল আমাদের সঙ্গে। সারাটা পথ একটিও কথা বলে নি।

ওর মুখখানায় অসংখ্য ক্ষতের চিহ্ন। রেখায় রেখায় সমাচ্ছন্ন মুখখানা গভীর ত্রাসের সঞ্চার করে। চারদিকে পাহাড় দুর্গ প্রাচীরের মতোই দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ছে ঝরণাধারা। আড়াইশো ফিট উঁচু থেকে গড়িয়ে-পড়া জলধারার অশ্রান্ত গর্জন। জোড়াজোড়া থাম লাগানো প্রাচীন অট্টালিকা। অবহেলিত বাগান। রঙীন কাঁচের জাফরি। কাঠের খড়খড়ি। সিংহ দরজা হাট করে খোলা। বারান্দায় ধূলো। পায়রার বিষ্ঠা। সারা অট্টালিকা থেকে জীর্ণতার প্রাচীনতার গন্ধ ভেসে আসে। অট্টলিকার প্রহরী বা চৌকিদার লছমনের ইয়া গালপাট্টা দাড়ি। প্রকাণ্ড শরীর। হাতের তালুতে সে ঘন ঘন খৈনি ঘষে। আসার সময় জঙ্গলা পথে দেখে ছিলাম পদ্মগোখরো কুণ্ডলী ছেড়ে ফণা তুলেছে! খরিস গোখরো জীর্ণ বাগিচার গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে। বহিধর আশা দিয়েছিল মাইফেল বসবে। মজলিশ বসবে। নৃত্যপটিয়সীর নাচ দেখে মুগ্ধ হবো। তার বদলে ঝড়, জল, বিদ্যুতের ঝলকানি। মেয়েলী কণ্ঠের কান্না। দূরে একটা কুকুর ককিয়ে ককিয়ে কাঁদছে। ফেউ ডাকছে। আশে পাশের জঙ্গলে বাঘ আছে নিশ্চয়।

অরক্ষিত বাগানের এধার ওধারে চন্দ্র মল্লিকার চারা।

রাজরাজড়ার প্রাসাদ। বর্তমানে অবহেলিত পরিত্যক্ত। সংস্কারের কোনো চিহ্ন নেই। দরজা খোলার সময় শব্দ হয়েছিল ক্যাচ্ ক্যাচ্ করে। ঘরগুলোর এখানে সেখানে মাকড়সার ঝুল ঝুলছে। আরশোলা উড়ছে ফর ফর করে। বারান্দায় সারি সারি থাম। জীর্ণতার আভাস সর্বত্র। শঙ্খচূড়ের খোলশ নজরে এলো। জানালার গ্রিলে জং ধরে গাঁথুনী ফাটিয়ে ফেলেছে। দাঁড়াশ সাপটা জিভ বের করে আছে। বাতাসে গন্ধ শুঁকছে। হঠাৎ বাতাসে আঁ আঁ করে একটানা একটা স্বর। খানিকটা গোঙানী। চমকে উঠি। এ আবার কি? একে গোঙাচ্ছে। কোকাচ্ছে—কে? বহিধরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—"কে গোঙায়?" ও গোঙানী

শুনে প্রাণীজগত শিউরে ওঠে। বহিধর বলে—সেই মেয়েটা।—কোন্ মেয়েটা ?—সেই ওরাঁও মেয়েটা। আজ দেওগড়ের আদিবাসী পল্লীতে যাকে দেখেছিলেন। ও ডাইনীর আর্তস্বর। আদিবাসীদের সমাজ সংস্কৃতি, রীতিনীতি আচার ব্যবহার সমীক্ষার জন্যে ওড়িষ্যার অনেক স্থানেই ঘুরতে হয়েছে। গেছি ময়ূরভঞ্জ, কেওনঝাড়, ফুলবানি, সুন্দরগড়, সম্বলপুর, বোলাঙ্গীর, কালাহাণ্ডি এবং কোরাপুটক অঞ্চলে, কোঁধ, কোয়া বোন্দা, গঢ়াবা, পরজা, সাঁওতাল, জুয়াঙ, ওরাঁও, সাওরা, গোণ্ড, হো, খারিয়া.ভুঁইয়া, বিনঝাল এবং বাথুডি প্রভৃতি উড়িষ্যার বাষট্টিটি আদিবাসীগোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচিতি ঘটেছে।

—আঁ। আঁ। আঁ। করুণ একটানা একটা স্বর।—ওরকমভাবে গোঙাচ্ছে কেন ? প্রশ্ন করি বহিধরকে। এরপর বহিধর আমার কানে কানে যা বললো তাতে আমি হতচকিত, বিস্মৃত। অবাক বিস্ময়ে বহিধরের দিকে তাকিয়ে থাকি। এও কি সম্ভব? বহিধর খানিকটা হেসে বলেছিল—পুরুষ ভালুকটার সঙ্গে ওর নেহাতই সুরুচিপূর্ণ সম্বন্ধ নয়।

বার বার মনে পড়েছিল সেই আদিবাসী মেয়েটিকে। দিনের বেলা যাকে দেখেছিলাম। দেওগড়ের প্রান্তরে ধুলোর ঝড় উঠেছিল। সারাটা প্রান্তর কঠিন কর্কশ। দুপুরের রোদে তেতে ফেটে একাকার। কয়েকটা মুরগীর খোঁজে আমি আর বহিধর আদিবাসী পল্লীর দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম। বিরাট লোমশ ভালুকটাকে নিয়ে মেয়েটা দাঁড়িয়েছিলো। ভালুকটার নাকে দড়ি। দড়ির একপ্রান্ত মেয়েটার হাতে। মেয়েটা ডুগডুগি-বাজাচ্ছিল। ভালুকটা প্রকাণ্ড। দুপা তুলে দাঁড়ালে মেয়েটার মাথার অনেকটা ওপরে থাকে ওর মাথা। মেয়েটার গড়ন-সড়ন ভালো। চেহারায় জৌলুস রয়েছে। সারা শরীরে যৌবনের ঢল নেমেছে। নির্জীব পুরুষগুলোর কামনার শান্ত নীরে নাড়াচাড়া দিয়ে ঢেউ-এর সৃষ্টি করে অক্লেশে।

নাচেগানে পারদর্শিনী মেয়েটা। ঢঙ ছলাকলায় রপ্ত। মেয়েটা বলেছিল—সাহেব, আমি নাচ দেখাবো। মাথা নেড়ে অসম্মতি জ্ঞাপন করে-

ছিলাম। ঝুলির ভেতর থেকে একটা সাপ বের করে আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিল। আমি সভয়ে পাঁচ পা পেছিয়ে গিয়েছিলাম। মেয়েটা হেসে কুটি পাটি। শরীরের রঙ কুচকুচে কালো হলেও শ্রীমণ্ডিত মুখশ্রী। মুক্তোর মতো সাদা দাঁতগুলো।

—ঢোঁড়া সাপ গো। ঢোঁড়া সাপ। একেবারে নির্বিষ।—আমি বলি—এই। এসব কি হচ্ছে। হেসে গড়িয়ে পড়ে মেয়েটা। মেয়েটা একটু দূরে সরে যেতেই বহিধর ফিসফিস করে বলেছিল—এ মেয়ে নয়। সাক্ষাৎ ডাইনী। রাক্ষসী! রাতের বেলা এ বাচ্চা ঘর থেকে তুলে আনে। তারপর রক্ত চুষে খায়। মাংস মজ্জা মেদ খেয়ে হাড় চুষে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

—দূর। দূর।

আমি প্রতিবাদের ঝড় তুলি।

—আমার কথা এখন বিশ্বাস করছেন না। পরে করবেন। রাতের বেলা অশরীরী হয়ে ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। তার-পর ঘরের বাচ্চা তুলে নিয়ে পালায়।

—প্রমাণ আছে কোনো। আমার প্রশ্ন।

—গত দু সপ্তাহের ভেতর দুটো কেস হয়েছে। দুটো ওরাঁও পরি-বারের বাচ্চা হারিয়েছে। গাঁয়ের বাইরে একটা জলা জায়গায় ওদের পাওয়া গেছে। দুটো বাচ্চাই মৃত। ওদের গলার কাছে দুটো ফুটো। দুটো ফুটো থেকে রক্ত চুষে খেয়েছে ডাইনীটা। বাচ্চা দুটোর সারা দেহ নীলচে হয়ে গেছে।

—এমন তো হতে পারে যে কোনো জন্তু বাচ্চা দুটো তুলে নিয়ে গেছে আর তারপর ওই অপকর্ম করেছে।

—আরে না। না। মেয়েটা ওরাঁওদের ঘরের আশেপাশে সারাটা দিন ঘুর ঘুর করে বেড়িয়েছে। যেখানে মৃতদেহ পাওয়া গেছে সেখানে কাদার ওপর মনুষ্যের পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে। আর সে ছাপ নাকি পুরুষের নয়। মেয়েছেলের। এ ছাড়া গাঁয়ের কেউ কেউ দেখেছে অতি

প্রত্যুষে ডোবার জলে ওকে শাড়ি ধুতে।

—অত ভোরে ওর শাড়ি ধোবার প্রয়োজনটা পড়লো কিসে ?

—পুলিশ এসেছিল ?

—বেশী বেলায় পুলিশ এসেছিল। কিন্তু তার আগে সব ধুয়ে মুছে সাফ। যে পায়ের ছাপ কাদার ওপর গাঁয়ের লোকেরা দেখেছিল পুলিশ এসে সে সব পায়ের ছাপের চিহ্ন পর্যন্ত খুঁজে পায় নি। সমস্ত প্রমাণ লোপাট করে দিয়েছে।

—ওর স্বামী নেই ?

—গোটা তিনেক স্বামী একের পর এক এসেছে। দুটো মরেছে। একটা পালিয়ে বেঁচেছে।

—ওর সন্তান নেই ?

—ওখানেই সব গোলমাল।

সন্তানের জন্যে মেয়েটা ডুকরিয়ে ডুকরিয়ে কাঁদে। সন্তান পেটে আসে। টিকে থাকে কিছুদিন। তারপর নষ্ট হয়ে যায়। আর তারপর সন্তানের শোকে ও যে কাণ্ডটা করে তা আপনার চিন্তার বাইরে। মাটিতে গড়ায়। ধুলোতে লুটোপুটি খায়। অন্যের সন্তান মারা। হুঁ! পাপ তার বাপকেও ছাড়ে না।

আমাদের কথাবার্তা শেষ। মেয়েটা ততক্ষণে আমাদের দিকে এগিয়ে এসেছে।

—আমার কাছে অনেক সাপ আছে। তুই নিবি। এই দ্যাখ। ঝুলি থেকে সে একটার পর একটা সাপ বের করতে থাকে। শঙ্খচূড়, গোখরো, কেউটে।—দ্যাখ। দ্যাখ। ইটাকে দ্যাখ। বলেই সে একটা সাপ আমাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দেয়। আমি সভয়ে দশ পা পিছিয়ে যাই। মেয়েটা হেসে গড়িয়ে পড়ে।

এরপর আমরা গাঁয়ের দিকে এগিয়ে যাই। মেয়েটা কিন্তু পিছু পিছু আসতে থাকে। গাঁটা কি রকম নোংরা আর অপরিষ্কার। সারিদিয়ে হোগলার ঘর একটার পর একটা। হোগলার ঘরগুলোর ভেতর চোলাই

মদের আড়ত। আবগারী বিভাগের রক্তচক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে দিব্যি কারবার চলেছে। পেট মোটা আবগারী দারোগা ছুটো পুলিশ নিয়ে তদারকি করতে এসেছে। তারা এসেছে পচাই মদের সন্ধানে। গাঁয়ের লোকগুলো তাদের গুপ্তভাণ্ডার দেখাতে রাজী নয়। ওরা হাঁকডাকে চারদিকে সোর-গোল তুলেছে। প্রান্তর মুখরিত। দারোগা আর পুলিশ ছুটো ছু'চার বোতল যা পেয়েছে তা নিজেরা পান করে মশগুল আর মাতোয়ারা। প্রথমদিকে ওরা হোগলার ভেতরে ঢুকে সব তছনছ করেছে। কাজ ভালোরকম হচ্ছে না দেখে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে জনাকয়েককে বেধড়ক পিটিয়েছে। এরপর ওদের গুপ্তধনে হাত দিয়েছে। বের করেছে পচাই মদ। তা থেকে খানিকটা গলায় ঢেলে দিয়ে এখন নিজেরাই কাহিল। সেই ওরাঁও মেয়েটা, ওর নাম মঙ্গলী। মেয়েটা আবগারী লোকগুলোর সঙ্গে অবিরাম যুঝে যাচ্ছে। কাটাকাটা কথার তুবড়ী ওড়াচ্ছে। পুরুষ-গুলো যখন ফ্যাকাসে মুখ নিয়ে বেআইনী মদের ঢালাও কারবার ঢাকতে হিমসিম খাচ্ছে, কোথা দিয়ে কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না, মঙ্গলী তখন ধীরে ধীরে বুকের বাঁধন আলগা করেছে। ওর দৃষ্টিতে মাদকতা মাখানো। ওর চাউনি পুরুষগুলোকে অনায়াসে কামাগ্নি অনলে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে। এতো শক্তি ওর দেহটার ভেতর। ও একটা ঘূর্ণীঝড়। রাতের সুরার ঝাঁঝ তখনো মেয়েপুরুষগুলোর মস্তিষ্কে। ঝড়ের বেগে মঙ্গলী সারাটা অঞ্চলে ঘুরপাক খাচ্ছে। চোলাই মদের আড়ত থেকে মাল বের করতে গিয়ে ওরা নাস্তানাবুদ হয়েছে। এখন ওদের দৃষ্টি মঙ্গলীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ঘুরপাক খাচ্ছে। মঙ্গলীর মুখে কাল-নাগিনীর মতোই বিষ। ও যাকে ছোবল মারে, ঠোঁটে ঠোঁট ঘষে, সে নেশায় ঝিমুতে থাকে। বিহ্বল আর মোহাচ্ছন্ন হয়। এর ওপর আবার মঙ্গলীর কণ্ঠে একটা হিন্দিগানের কলি। মেয়ে পুরুষগুলোর অনেকেই রাতে প্রচুর মদ্যপান করেছে। নেশার ঝোঁকে অনেকেই মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে।

কারু কারু দেহ পর্যন্ত তল্লাসী হয়ে গেছে। হিন্দি ফিলমী গানা শুনে

আবগারী অফিসের লোকগুলো গোঁফ মুচড়িয়েছে। হাঁততালি দিয়েছে। মঙ্গলীর ওপর ওদের নজরের বাড়াবাড়ি দেখে হিংসেতে মাথা খুঁড়ে মরেছে কতোগুলো উঠতি বয়সের মেয়ে। যৌবনের ঢল নেমেছে যাদের দেহে। নারী-মহলে এরই ভেতর চলেছে কানাকানি। ফিসফিসানি আর গুঞ্জন। মঙ্গলীর একমাত্র চিন্তা আবগারী লোকগুলোকে কি করে বিভ্রান্ত করা যায়! থানাতল্লাসী যত কম হয় ততই মঙ্গল। ওদের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে পুরুষগুলো যাতে মাল পাচার করবার খানিকটা সুযোগ সুবিধে পায়। কিছু মাল এরই ভেতর মাটিচাপা পড়েছে। মঙ্গলীর দেহটা বনবন করে ঘুরছে। নাচছে মঙ্গলী। আর ওরা দৃষ্টি দিয়ে লেহন করছে মঙ্গলীর সারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। খুবলিয়ে খুবলিয়ে খাচ্ছে যেন। ওদিকে নিপুণ হাতে মাল পাচারের চেষ্টা চলছে। মঙ্গলী ঘুরে ঘুরে নাচছে। গাইছে। কখনো কখনো এগিয়ে এসে আবগারী বিভাগের পুরুষটির থুতনী আদর করে নেড়ে দিচ্ছে। লোকটির কাছে এ আনন্দ অসহ্য।

সে দৌড় শুরু করেছে মঙ্গলীকে ধরবার জন্যে। কিন্তু মঙ্গলীকে ধরা সহজ নয়। সে এক বন্যহরিণী। ছুটে পালাচ্ছে বার বার। কিছুতেই ধরা দেবে না। সে ক্ষিপ্ত গতিতে এবং অনায়াসে উঠে যাচ্ছে কোনো এক গাছে! তরতর করে এক গাছে চড়লো। পর মুহূর্তে গাছ থেকে নেমে এসে ছুট লাগালো। উঠে পড়লো আর এক গাছে। পঁই পঁই করে দৌড়ুচ্ছে মঙ্গলী। ঘোড়ার মতো চক্কর খাচ্ছে সারাটা অঞ্চল। পুরুষ-গুলোর ভালো লাগছে এ খেলা। ওদের পা টলছে। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়েছে। যে পুরুষ মেয়েছেলেগুলো অবাধ্য হয়ে পিটুনী খেয়েছে তাদের শরীরে অব্যক্ত এক যন্ত্রণা তির তির করে বয়ে চলেছে। যে নারীপুরুষ চোলাই করা পচামদ গিলেছে তাদের শরীরের কোষে কোষে মস্তিষ্কে জট পাকানো অজস্র স্নায়ুতে এক ব্যথা বয়ে চলেছে।

ঘরগুলোর আশেপাশে পাঁক আর কাদায় মাখামাখি। মাটির ভাঁড় ছড়িয়ে ছিটিয়ে একাকার। ছিন্ন হোগলা, মাকু, জন্তু-জানোয়ারের হাড়

চামড়া ইতস্তত ছড়ানো। পচে গলে নরক গুলজার। ছিন্ন ভিন্ন কাঁথা কাপড়। প্রথম দিকে চলে খানিকটা সময় খানাতল্লাসী। খানিকটা পিটুনী। তারপর পান, নেশা। নাচগান। হুল্লোড়। প্রতিবারই এরকম হয়। ঘটনার পরিবর্তন নেই। ঐ যে সড়কটা সোজা দেওগড়ের দিকে দৌড়িয়েছে ওটা বানাবার ভেতর—মঙ্গলীর হাতছিল অনেকটা। প্রথমে সড়ক বানাবার কাজে চলছিল টালবাহানা। সোলার টুপি মাথায় কনট্রাক্টারবাবু মজত্বর নিয়ে টালবাহানা চালাচ্ছিল। শেষে মঙ্গলী অসাধ্য সাধন করলে। মঙ্গলীর ওপর ভার পড়েছিল কনট্রাকটারবাবুকে সামলাবার। মঙ্গলী প্রথমে রাজী হয় নি। দলের বাকী মেয়ে-পুরুষগুলোর কাছে এ আপত্তি হয়ে উঠেছিল এক ক্ষমাহীন গাফিলতি। মঙ্গলী প্রথমে রাগে গরগর করেছে।

এবড়ো খেবড়ো পাহাড়ী পথ। সড়কের একটা প্রয়োজন ছিল বৈকি। গ্রীষ্মে রুক্ষ তেতে ফেটে ওঠা জমিন। ফেটে চৌচির। মাঝে মাঝে ধুলোর ঝড় ওঠে। রৌদ্রের তাপে নারী পুরুষেরা হাঁপায়। জিভ বের করে কুকুরের মতো। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটে। কনট্রাক্টারের মাথায় সোলার টুপি। রঙটা আবলুস কাঠের মতো। খালি গা। সেখানে দরদর করে ঘাম ঝরে। সারাটা মুখে দেহে বসন্ত রোগ তার প্রলয় নৃত্যের সাক্ষ্য রেখে গেছে। দাড়ি গোঁফে আচ্ছন্ন মুখমণ্ডল। সামনে তুটো দাঁত নেই। বাকী দাঁতগুলোতে পানের ছোপ। ভুঁড়িটাকে অতি কষ্টে বেল্ট দিয়ে বাঁধবার আপ্রাণ প্রয়াস। বেল্টের আবেদন নিবেদন আকুলি বিকুলি অনায়াসে অগ্রাহ্য করে ভুঁড়ি অনায়াসে বের হয়ে আসে বারে বারে। প্রথমদিন কনট্রাকটার মঙ্গলীর দেহে হাত দিতেই মঙ্গলী এক ঝটকায় হাত সরিয়ে দিয়েছিল। কনট্রাকটার দত্ত একমুঠো এক টাকার নোট মাটিতে ছড়িয়ে দিয়েছিল। ভেবেছিল মঙ্গলীর চোখ চক চক করে উঠবে। হয়তো বা মঙ্গলী মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আর মঙ্গলীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ক্ষুধার্ত জংলী মনুষ্যরূপী বাঘটা। কিন্তু মঙ্গলী তাকিয়েও দেখে নি। দলের বাকী মেয়েগুলো নোটের লোভে মাটির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

মঙ্গলী নোটগুলোর দিকে ফিরেও তাকায় নি। কিছুতেই রাজী হয় নি কনট্রাকটারের অক্টোপাস বন্ধনে ধরা দিতে। দলের বাদবাকীরা মঙ্গলীকে দফায় দফায় অনুরোধ উপরোধ জানিয়েছে। ও শোনে নি। দলের সবাই-কার মতে এ হলো এক ক্ষমাহীন গাফিলতি। ওরা বলেছে—ছাখো না কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। গাঁয়ের মাতব্বর কি কাণ্ডটাই না করে। মঙ্গলীকে সমাজচ্যুত করাও অসম্ভব নয়।

মঙ্গলী রাগে ফুঁসেছে। রাগে গরগর করেছে। খিস্তি খেউড়ের অন্ত নেই। হাড়িয়ার হাড়ি চড়েছে। রসে মাতোয়ারা পুরুষগুলো। লঙ্কা আর পেঁয়াজের ঝালে জিহ্বা জ্বলছে। মঙ্গলী ইচ্ছা করেই পানে চূন বেশী মিশিয়েছে। কনট্রাকটারের অবস্থা সঙ্গীন। ছোট্ট দোকানে দোকানী বেগুনী ফুলুরী ভাজছিল। মঙ্গলী ওখান থেকে এক মুঠো নিয়ে এসে-ছিল। কনট্রাকটারবাবুর জন্যে। কনট্রাকটারবাবু ইঞ্জিনিয়ারবাবুকে নিয়ে এসেছিল। মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে শেষপর্যন্ত জল বেরিয়েছে। তাতেই লোকগুলো হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলেছে। হাঁটু পর্যন্ত আঠালো পাঁকে চটচটে হয়েছে। মাটি খুঁড়তে গিয়ে তল্লাটের জোয়ান বুড়ো অধিকাংশের কাজ জুটেছে। যেরকম দুর্দান্ত খরা গেল। না খেয়ে খেয়ে মরছিল লোকগুলো। কনট্রাকটার দেবদূত হয়ে দেখা দিয়েছে। ইঞ্জিনীয়ার-বাবুর দয়ায় তারা জল পেয়েছে। ভুখা থেকে বেঁচেছে। তাই গাঁয়ের লোকগুলোর অভিমত যে মঙ্গলী যদি কনট্রাকটারবাবুর একটু আদর যত্ন করে তবে ক্ষতিটা কোথায়।

সারি সারি জোড়া উনুন। মেটে হাঁড়ি। মাটির ঘর। খোড়ো চাল। শালপাতার ভেতর বাসী পচা ভাত। পোকা থিকথিক করছে। মাটি কেটে স্তূপ দেওয়া হয়েছে। জঙ্গল কেটে বসত করা হয়েছে। নেশার ফলে কোন্দল গজরানির অন্ত নেই। চারপাশে পচা গোবরের গন্ধ। নেশায় পুরুষ মেয়েগুলো জড়াজড়ি করে পড়ে আছে।

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে কেউ বা ডাক ছাড়ছে। চোখে ধোঁয়া ধোঁয়া ভাব। দেহ হড়কাতে হড়কাতে চলেছে কেউবা। গাঁয়ের মেয়েপুরুষের অনুরোধে

নাচতে হচ্ছে মঙ্গলীকে। কোথা থেকে সে একটা ঘাঘরা জোগাড় করেছে। নাচের তালে তালে ঘাঘরা ফুলে ফুলে উঠছে। কনট্রাকটারবাবুর চোখের ইঙ্গিতের সঙ্গে নিজের চোখের ইঙ্গিত মিলোতে হচ্ছে ঘনঘন। গাঁয়ের যাদের সঙ্গে বাস তাদের কথা অমান্য করা যায় কখনো। গাঁয়ের খানা খন্দ বোজাবার দায়িত্ব কনট্রাকটারবাবুর। এবড়ো খেবড়ো মাটিতে সড়ক বানাবার দায়িত্ব ইঞ্জিনীয়ারবাবুর। ইঞ্জিনীয়ারবাবুর বন্ধু ওই কনট্রাকটারবাবু। তার অনেক পয়সা। পুরুষ মেয়েছেলেরা মাটি কাটলেই পয়সা পায়। এদিককার ঝোপ জঙ্গলগুলোতে হায়েনা চিতার বড্ডো উপদ্রব। এর উপর রয়েছে ম্যালেরিয়ার আধিক্য। বাচ্চাগুলোর দেহ শীর্ণ। ঠিক প্যাকাটির মতো। বিরাট পেট। ওরা প্রায়ই জ্বরে ধোঁকে। ধুকঁতে ধুকঁতে মরে যায়। জঙ্গল কাটবার প্রস্তাব এনেছে ওই কনট্রাকটার-বাবু। ডাক্তার বদ্যি ডাকবার দায় দায়িত্ব তার।—তোদের ভালো হবে। সব আমি করে দেবো। বলেই ফোকলা মুখে ফিক করে হাসে। তার-পরই আড় চোখে তাকায় মঙ্গলীর দিকে।

মেয়েগুলোর দেহ যেন রসকষ শূন্য। মাটির মতোই চামড়া ফেটে ফুটে চৌচির। একমাথা রুক্ষ চুল। চুলে উকুন কিলবিল করে। শুধু রস যা রয়েছে ওই মঙ্গলীর দেহে। চাকচিক্য সব ওখানে। মাঝে মাঝেই প্রান্তরে ধুলোর ঝড় ওঠে। রৌদ্রের তাপে নারী পুরুষ জিভ বের করে কুকুরের মতো হাঁফায়। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটে। কনট্রাকটারবাবুর কালো দেহ বেয়ে গলগল করে ঘাম গড়ায়। তাপানলে সারাটা অঞ্চল জ্বলছে। মাঝে মাঝে লু চলে। তপ্ত হাওয়া হু হু করে বইছে। আগুনের ঝাপটা মারছে ঘন-ঘন মুখে চোখে। অনেকদিন থেকে প্রচণ্ড খরা চলেছে। খাল বিল শুকিয়ে কাঠ। মাঠ ঘাট ফেটে ফুটি ফাটা। ফসল জ্বলেপুড়ে খাক। ঝিঙে, ঢেঁড়স, উচ্ছে, পুঁই, তরমুজ, ফুটি, শশা শুকিয়ে লাল। ছুটো নলকূপ অকেজো হয়ে পড়ে আছে। কূপ শুকিয়ে গেছে। খরার সঙ্গে ওরা আর কতকাল লড়বে। অর্ধাহার, অনাহার আর কতো সহ্য করবে। চাষের কাজ নেই। দিন মজুরী পাচ্ছে না। কনট্রাকটার পয়সা ছাড়তে

রাজী। সড়কের কাজে পুরোপুরি হাত দেবে সে। নলকূপ সারাবে। শুধু একটি শর্ত, মঙ্গলীকে তার চাই। কামজ্বালায় জর্জরিত কনট্রাকটার। কিন্তু মেয়েটা ভারী বদখত। একগুঁয়ে। কনট্রাকটারের কাছে ধরা দিতে চায় না।

হাত গলিয়ে বেরিয়ে যায়। মঙ্গলীর আপত্তির কারণ গাঁয়ের মেয়েগুলো কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। এর আগে মঙ্গলী হু'বার ঘর ছেড়ে পালিয়েছে। পুরুষমানুষ শরীরে একটু আধটু হাত দেবে বৈকি। মঙ্গলী কি দেখতে পাচ্ছে না চারদিকে কি ভীষণ অজন্মা। মাটি তেতে ফেটে কি হয়েছে। কি প্রচণ্ড দাবদাহ। খরার কি প্রচণ্ড প্রকোপ। দলের তিনটি মেয়ে দৌড়িয়ে চলে যায় মঙ্গলীর কাছে। জাপটিয়ে ধরে ওকে। ধরে মাটিতে আছড়িয়ে ফেলে। চেপে ধরে ওকে। মঙ্গলী হাত পা ছোঁড়ে। আঙুলের বড় বড় নখ দিয়ে ওদের আঁচড়িয়ে খিমচিয়ে অস্থির করে তোলে। হু'চারটে ভয়ানক কামড় দেয়। কনট্রাকটার এগিয়ে এসে মঙ্গলীর শরীরে হাত রাখতে চেষ্টা করেছিল। মঙ্গলী কষে এক লাথি ঝেড়ে দেয়। কনট্রাকটার হু'হাত দূরে ছিটকিয়ে পড়ে। টুপিটা পড়েছে আরো দূরে। ততক্ষণে মঙ্গলী মেয়েগুলোর হাত থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে নিয়েছে। ধূলোবালি ঝেড়ে কনট্রাকটার উঠে দাঁড়িয়েছে। থু করে একরাশ থুতু মঙ্গলী কনট্রাকটারের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিয়েছে। বন্য বাঘিনী কিছুতেই পোষ মানবে না।

উড়িষ্যার দেওগড়ের প্রাসাদে বসে ভাবছিলাম এ আমি কোথায় চলে এলাম। বাইরে ঘনঘন বিদ্যুতের ঝিলিক। কোথায় যেন বাজ পড়লো। মাঝে মাঝেই ককিয়ে ককিয়ে কান্নার শব্দ। অস্বোয়াস্তি ক্রমশ যেন বাড়ছে। বিদ্যুতের ঝলকানিতে জানালা দিয়ে বাইরের অনেকটা দূর পর্যন্ত দেখা যায়। আড়াইশো ফিট উঁচু থেকে প্রধানপাতের জলধারা গড়িয়ে পড়ছে। ঝরণা যেখান থেকে নেমে আসছে সেখানে পাহাড়ের ভেতর একটা গর্তে একটি বাঘের এবং সাপের মূর্তি রয়েছে। বামরা

স্টেটের রাজকুমার পাহাড়ের বুকে গর্তের ভেতর একটি ব্যাঘ্রকে গুলি করে মেরেছিল কিন্তু রাজকুমার কি জানতো যে বাঘের সঙ্গী দুর্দান্ত একটা কোবরা রয়েছে ওই গর্তে। কুমার যেইমাত্রবাঘেরসন্ধানেগর্তের ভেতর হাত ঢুকিয়েছে সেইমুহূর্তেকোবরারএকতীব্রছোবল।সঙ্গেসঙ্গে রাজকুমারের অপমৃত্যু। বাঘ আর কোবরা সঙ্গীরূপে সহাবস্থানকরতো ওই গর্তের ভেতর। বন্ধুর মৃত্যু সাপটা সহ্য করতে পারে নি। অন্ধকার বারান্দায় মসমস করে জুতোর শব্দ হয়। -ও কে? প্রশ্ন করি বহিধরকে।—কুমার সাহেব। একগাল হেসে অর্জুন বহিধর উত্তর দেয়।

—কোন্ কুমার সাহেব? প্রশ্ন করি।

—কেন? ওই পাহাড়ের গহ্বরে যার মৃত্যু হয়েছে তারই অশান্ত প্রেতাত্মা ঘুরে বেড়ায় প্রাসাদের অন্দরে বাহিরে। পাহারা দিয়ে বেড়ায় প্রাসাদ। অতি সহজ সুরে বলে অর্জুন বহিধর।

বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না বহিধরকে। বানিয়ে বানিয়ে বলছে নাকি লোকটা সব কিছু। আমাকে ভয় দেখিয়ে ওর লাভ। খানিকটা অন্যমনস্কছিলাম। হঠাৎ দরজা ঠেলে কে যেন ভেতরে প্রবেশ করলো। তাকিয়ে দেখলাম সেই লোকটা। সেই বিকেলের পথ প্রদর্শক। এক মুখ দাড়ি গোঁফ। ওর মুখখানা গভীর ত্রাসের সঞ্চার করে। কোনো কিছু বলে না। শুধু নীরবে তাকিয়ে থাকে। চোখদুটো যেন জ্বলছে। আমার অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে ছাড়ে।

—ও কথা বলে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে- কি চাস্ এখানে? তবুও লোকটা উত্তর দেয় না। বহিধর চিৎকার করে বলে—কি চাস্? উত্তর দিস না কেন? এখানে এ সময় কি দরকার?

ওর সম্ভবত বহিধরের সঙ্গে প্রয়োজন ছিল। দেহাতী ভাষায় দু'চারটে শব্দ উচ্চারণ করলে। সে ভাষার বিন্দু বিসর্গ বোঝবার উপায় ছিল না। ও খানিকটা বাদে চলে গেল। বহিধর জানালো লোকটা ঠিক প্রকৃতিস্থ নয়। ও প্রজনন ক্ষমতা রহিত। তাই ওর বউটা চলে গেছে অন্য পুরুষের সঙ্গে। ওর জীবনের প্রতি কোনোই আসক্তি নেই। মেজাজটা

ওর সব সময়ই খিঁচড়ে থাকে। ওর চেহারা চরিত্র এতই খারাপ এবং বেয়াড়া ধরনের যে অন্য মেয়েছেলে ওর ত্রিসীমানা মাড়ায় না পর্যন্ত। তা যাই হোক না কেন ওর উপস্থিতি এ প্রাসাদে এ সময়ে আমার কেনজানি বরদাস্ত হয় না। সমস্ত আবহাওয়াটা বিষাক্ত ঠেকে। নিজেকে নিজের ধিক্কার দেবার বাসনা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়। কেন এসে-ছিলাম? গানবাজনা শোনবার লোভটা সংবরণ করলে দোষটা কি ছিল।

বহিধর মদের বোতল থেকে গ্লাসে মদ ঢালে। আমি ও রসে বঞ্চিত।

—জানেন সাহেব। এখনো সম্বলপুরের বনেদী এবং ধনী লোকদের ভেতর কারু কারু কাছে ডায়মণ্ড রয়েছে।

—আমি বিশ্বাস করি নে।

—না। আমি ঠিকই বলছি। গেজেটিয়ার অব India তে লিপিবদ্ধ রয়েছে এ কথা। জোর দিয়ে বলে বহিধর। বহিধর সে রাতে আমার কাছে পুরোনো দিনের কাহিনী বিবৃত করেছিল।

—সম্বলপুরে প্রথম চৌহান নৃপতি বলরামদেবের রাজত্বকালে জাগ্রত দেবী সামলাই দেবীর মূর্তি শিমূল গাছের নিচে পাওয়া গিয়েছিল। আর দেবীর নামানুসারে সম্বলপুর নগরীর নামকরণ হয়েছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে বলরামদেব রাজত্ব করে গিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় শতাব্দীতে গ্রীক ভৌগলিক টোলিমি মানদা নদীর তীরে সম্বলপুর নগরের কথা উল্লেখ করেছিলেন। আর তিনি বোধ করি মহা-নদীর তীরে সম্বলপুরের কথাই উল্লেখ করেছিলেন। মধ্য যুগে বৌদ্ধ সাহিত্যে সমভালের উল্লেখ পাই।

—ইতিহাস শোনাচ্ছেন আমাকে। ডায়মণ্ড কাহিনী শোনান। বলি আমি। অর্জুন বহিধর কিন্তু বলে চলে তার কাহিনী।

—সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসী পর্যটক ট্যাভারনিয়ার সুমেল-পুরের উল্লেখ করেন। আর সঙ্গে সঙ্গে এ তিনি উল্লেখ করেন যে সুমেল-

পুরের মাটি থেকে প্রচুর ডায়মণ্ড পাওয়া যেত। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গিবনসাহেবতাঁর Decline And Fall Of Roman Empire নামে বইটিতে বলেছেন সুমেলপুরের খনি থেকে প্রচুর ডায়মণ্ড রোমের বাজারে চালান যেত। মহানদীর ঠিক মধ্যেখানে ঝুনান্ গ্রামে হীরাকুঁদ নামে দ্বীপ ছিল। চার মাইল লম্বা ঐদ্বীপ মহানদীকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে। আমার গল্প শুনতে মন্দ লাগছিল না।

বহিধর বলে চলে—১৭৫০ সালে বৃটিশ সম্বলপুর ডিস্ট্রিক্ট রাজা নারাণ সিং-এর কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছিল। আর ঠিক তারপর থেকেই সম্বলপুরের ডায়মণ্ডের জন্যে কোম্পানীর লোকেরা পাগল হয়ে উঠে-ছিল। রাজা যেদিন লোক মারফত কোম্পানীর লোকের কাছে ডায়-মণ্ড পাঠিয়েছিল সেদিন থেকেই লর্ড ক্লাইভের দৃষ্টি সম্বলপুরের দিকে নিবদ্ধ ছিল। আর সে সময় থেকেই নাকি সম্বলপুরের সঙ্গে ডায়মণ্ডের ব্যবসা চলেছিল। মিস্টার মট্রে জলজঙ্গল, দুর্গম পথ, স্থানীয় লোকে-দের অতর্কিত আক্রমণ, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর উপেক্ষা করে প্রাণটি হাতে নিয়ে ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্বলপুরের-উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল। তখন সম্বলপুরে প্রচণ্ড অরাজকতা চলেছে। হেবে নদী এবং মহানদীর সঙ্গমস্থলে তখন ডায়মণ্ড পাওয়া যাচ্ছিল। মট্রে সাহেব কয়েকটা ডায়মণ্ড কিনতে সক্ষম হয়েছিল। এর পর লেফটেনাণ্ট কিট্রো সাহেব ১৮৩৮সালে ডায়মণ্ডের লোভে উড়িষ্যার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ করে চলে এসেছিল।—জানি লোভ মানুষকে কত পাগল করে দেয়। বলি আমি।

—মেজর অনস্লের রিপোর্ট থেকে জানতে পারি কি করে হীরাকুঁদের বালু থেকে স্বর্ণ উত্তোলিত হতো। মারহাট্টাদের শাসনকালে একটা বিরাট ডায়মণ্ডপাওয়া গিয়েছিল। জিওলজিক্যাল মিউজিয়ামে এখনো একটা ডায়মণ্ডরয়েছে যা সম্বলপুর থেকে পাঠানো হয়েছিল। সম্বলপুর থেকে এসিয়াটিক সোসাইটিকে মেজর অনস্লি পাঠিয়েছিল ছাব্বিশ ক্যারেট ওজনেরএক ডায়মণ্ড। অর্জুন বহিধর থেমে যায়।

না দেখতে পাচ্ছি—বহ্নিধর অনেক খোঁজ খবর রাখে। ডায়মণ্ড সম্বন্ধে তার বিরাট কৌতূহল। আমার মনে নানা চিন্তা পাক খায়। আবারও সেই হীরের উন্মাদনা। দক্ষিণ আফ্রিকার কিম্বার্লি। ভারতের গোলকুণ্ডা মাইনস্। মধ্য প্রদেশের পান্না জেলার ৭০০ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে ডায়মণ্ড উত্তোলন ব্যবস্থা। কিম্বার্লিতে ১৮৩৯ সালে মেষপালকের হাতে এলো তিরাশি ক্যারেট ওজনের বিরাট ডায়মণ্ড। সেটি 'স্টার অব সাউথ আফ্রিকা' নামে খ্যাত। 'গ্রেট মোগল' 'রিজেন্ট' আর 'কোহিনূরের' জন্মও ভারতবর্ষে। 'গ্রেট মোগল', গোলকুণ্ডা মাইনে পাওয়া গেল। ১৯০৫ সালে পাওয়া 'কুল্লীনাল' হীরেটি নাকি এ পর্যন্ত যত হীরে পাওয়া গেছে তার মধ্যে সর্ববৃহৎ। এক একটা ডায়মণ্ডের সঙ্গে জড়ানো রয়েছে কত প্রবঞ্চনা, লাঞ্ছনা, হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থ, লোভ, মোহ। 'কোহিনূর' প্রথমে ১৩০৪ সালে মালয়া রাজার কাছে ছিল। তারপর যায় বাবরের কাছে। ১৫২৬ সাল থেকে দু শতাব্দী এ ডায়মণ্ড মোগল সম্রাটদের কাছেই ছিল। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে পারস্যের নাদির শাহ ভারতবর্ষে তাণ্ডবলীলা চালাবার কালে সুকৌশলে ওই ডায়মণ্ডটি হস্তগত করেছিল। ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে নাদির শাহকে হত্যা করা হয়। তার ছেলেকে ওই ডায়মণ্ডের জন্যে প্রচুর অত্যাচার সহ্য করতে হয়। এরপর ডায়মণ্ডটি চলে যায় আফগানদের হাতে। এরপর শিখদের হাতে এবং সর্বশেষ চলে যায় বৃটিশদের কাছে।

গল্প বলবার ফাঁকে ফাঁকে লক্ষ্য করেছিলাম বহ্নিধর কেমন যেন অন্যমনস্ক। কি যেন চিন্তা করছে। মাঝে মাঝেই উঠে দাঁড়াচ্ছে। আবার বসে পড়ছে। ঘনঘন মদ্য পান করছে। এরপর একসময় সে উঠে পড়লো এবং দরজা খুলে অন্ধকারের ভেতর অদৃশ্য হলো। আমি ভাবছিলাম আমার কি করা উচিত। আর করবারই বা কি আছে। বাইরে ধুলোর ঝড়। ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। এ রহস্যপুরীতে না এলেই ভালো ছিল। অর্জুন বহ্নিধর মাঝে মাঝেই দরজা খুলে বারান্দা ধরে কোথায় যেন যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে কেন যাচ্ছে কে বলতে পারে।

হঠাৎ শুনেছিলাম একটা আর্তনাদ। একটা গোঙানীর মতো শব্দ। অসম্ভব কৌতূহল হলো। কাঁহাতকইবা এমনভাবে চুপ করে বসে থাকা যায়। বাইরে ঝড় বৃষ্টি। থাক্। প্রাসাদের সর্বত্র ভয়াবহ অন্ধকার সব কিছু গ্রাস করে বসে আছে। ক্ষতি নেই। সমস্ত অট্টালিকা জুড়ে এক ভৌতিক আবহাওয়া। তবুও সাহসে ভর করে দরজা ফাঁক করে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম। বের করতে হবে আর্তনাদের উৎপত্তি স্থল। রহস্য স্থল খুঁজে বের করবার জন্যে এক পাগলামী আমাকে চেপে ধরে-ছিল। পা পা করে এগিয়ে গিয়েছিলাম। বারান্দা অন্ধকার। আমি সঙ্গে একটা টর্চ পর্যন্ত আনি নি। ম্যাচ বাক্স একটা রয়েছে বটে। কিন্তু হাওয়ার অসম্ভব জোর। জ্বালানো অসম্ভব। বিদ্যুতের ঝিলিক সম্বল করে এগিয়ে চলেছিলাম। ধূলিধুসরিত জীর্ণ দীর্ণ বারান্দা। মাকড়সার জাল। পায়রার বিষ্ঠা। গ্রাহ্য করি নি কিছু। সাপখোপ থাকতে পারে। কিন্তু আমাকে একটা গোঁ চেপে ধরেছে। বারান্দা ধরে এগিয়ে চলেছি। কামরার পর কামরা পার হচ্ছি। সব তালাবন্ধ। অন্ধকার গলা টিপে মারতে চায়। অট্টালিকার সর্বাঙ্গে একটা জীর্ণতা। ভ্যাপসা গন্ধ চতুর্দিকে। হঠাৎ। হ্যাঁ, হঠাৎ। একটা ঘরের ভেতর ক্ষীণ আলোর রেখা নজরে এলো। দরজা ভেজানো ছিল আর ভেজানো দরজার ভেতর দিয়ে পথ করে আলো বাইরে বেরিয়ে এসেছে। মোমের বা হারিকেনের আলো বলেই মনে হয়। এগিয়ে গিয়ে সন্তর্পণে এবং নিঃশব্দে জানালার খড়খড়ি ফাঁক করলাম। খড়খড়ি ফাঁক করে যে দৃশ্য নজরে এলো তাতে হৃৎপিণ্ড থেমে যাবার অবস্থা। ঘরের ভেতরে মোম-বাতি জ্বলছে। আর সেই আলোতে দেখলাম মঙ্গলীকে। আর দেখলাম বীভৎস মুখের অধিকারী সেই লোকটাকে। লোকটা মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে। লোকটার মুখের কশ বেয়ে ফেনা গড়াচ্ছে।

মঙ্গলীর হাতে এক কালনাগিনী। লোকটা গোঙাতে গোঙাতে বলে— আর একবার। আর একবার। মঙ্গলী মুহূর্তে নাগিনীর মুখটা লোকটার শরীরে চেপে ধরে। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা করুণ আর্তনাদের সঙ্গে

লোকটা মেঝের ওপর গড়াতে থাকে। মঙ্গলী বলে—একবার ছোবলে তোর আজকাল কিছুই হয় না।

—জানিস মঙ্গলী। তোরএসাপটাখুবভালো। খুবলক্ষ্মী। ওর ছোবলে যেরকম নেশা জমে এমন আর অন্য সাপের ছোবলে জমে নারে। বেশ বুঝতে পারলাম প্রচণ্ড নেশাগ্রস্ত লোকটা সাপের বিষ নির্বিবাদে হজম করছে। খানিকটা ব্যথা আর বিষের সঙ্গে রয়েছে নেশার উত্তেজনা। লোকটা আবার গোঙাতে গোঙাতে বলে—দেখিস মঙ্গলী। এবার তোর কোলে সন্তান আসবে। আমি পারবো তোকে একটা সন্তান দিতে। ছাই পারবি। কতোদিন ধরে বলে এলি সেই একই কথা। তুই পুরুষনোস্। মেয়েছেলের সাধ আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবারশক্তিতোর নেইরে। তাইতোপাঁচটা কালনাগিনীরভেতর বেছে বেছে এটাকে নিয়ে এলাম। সঙ্গে রয়েছে লতাপাতার রস। দেখি যদি কিছু হয়।

—তোর নাগিনীকে বল আর একবার ছোবল দিতে। নেশাটা ভালো করে জমে উঠুক।

—নারে। আমার ভয় করে। মঙ্গলী গম্ভীর স্বরে বলে।

—আমি সব কিছু ফিরে পাবো। তুই আর আমাকে ছেড়ে যাবিনে মঙ্গলী। তুই আমারই থাকবি। শুধু আমার। লোকটা নেশায় ডুবে আছে।

—বনবাদাড় ঢুঁড়েতোরজন্যেএকটা ওঝাখুঁজে পেয়েছি। এবারনির্ঘাত তোর সমস্ত ব্যারাম ঠিক হবে। তুই ভালো হয়ে উঠবি। কিন্তু।

মঙ্গলী খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে।

—কিন্তু কি? প্রশ্ন করে লোকটা।

—তোকে হীরের খবর দিতে হবে। বলে মঙ্গলী। আমি চমকে উঠি। লোকটা নিরুত্তর। মঙ্গলী বলে চলে—'এই প্রাসাদের মালিকদের পূর্ব পুরুষেরা পাহাড়ের কোন্ অঞ্চলে হীরে পুঁতে রেখে গেছে সে খবরতোর জানা আছে। তুই জানিসআর কেউ জানেনা। তোরভাই ভীমওঁরাও জানতো। ত্রিশ বছর ধরে ভীম ওঁরাও এ প্রাসাদ পাহারা দিয়েছে।

হীরের খবর ও রাখতো। সে রাতে আমোদ আহ্লাদ সুখশান্তি যখন চরমে উঠেছিল তখুনি ভীম ওঁরাও আমার কাছে সব ফাঁস করে দিয়েছিল। শপথ খেয়েছিল হীরে যেখানে লুকোনো আছে সে জায়গাটা আমাকে দেখিয়ে দেবে।

কিন্তু হীরের খোঁজ ভীম ওঁরাও শেষ পর্যন্ত দিতে পারলো না।

সে রাতেই ডাকাত পড়লো ঘরে। ডাকাতদের লক্ষ্য জিনিসপত্রের ওপর ছিল না। ছিল আমার ওপর। ভীম ওঁরাও রাজী ছিল না আমাকে ডাকাতদের হাতে তুলে দিতে। তাইতো এক ঘণ্টা ধরে সে চার ডাকাতের সঙ্গে একলা লড়াই করেছিল। আমাকে পালাবার সুযোগ করে দিয়েছিল।

—তারপর ? প্রশ্ন করে লোকটা।

—আমি পালিয়ে বাঁচলুম। ভীম ওঁরাও মরলো। আমি জানি মরবার আগে তোকে হীরের খবর দিয়ে গেছে। তুই ছাড়া ভীম ওঁরাও-এর এ সংসারে আর কেউ ছিল না। বল আমাকে হীরের খবর দিবি।

কোথায় হীরে লুকোনো আছে আমাকে বলবি। লোকটার তরফ থেকে কোনো উত্তর নেই।

—আমি ভালো বেদে খুঁজে বের করেছি। বেদে আসবে। মন্ত্র পড়বে। তামা, তুলসী, মাটির ভাঁড়ে তুক করা জল, বাটা চাল, ঝাঁটা, শেকড় বাকড় সমস্ত কিছু আমি যোগাড় করে এনে রেখেছি। বেদে একটা বিশেষ শেকড়ের কথা বলে দিয়েছে। অমাবস্যার রাতে দেহের সব বসন মাটিতে ফেলে রেখে বেছে আনতে হবে সে শেকড়।

কিন্তু একটা বস্তুর দরকার হবে।

একথা বলেই মঙ্গলী চুপ করে যায়।

লোকটা বলে—বল না কি বস্তুর দরকার হবে। চুপ করে রইলি কেন?

—না এখন বলবো না। সে সব পরে হবে।

—না তোকে এখুনি বলতে হবে।

লোকটা শোনবার জন্যে পীড়াপীড়ি শুরু করে।—না না। এখন বলে

লাভ নেই। তোকে দিয়ে সে বস্তু যোগাড় সম্ভব হবে না।

—আলবাৎ হবে। তুই আমার জন্যে এত করবি আর আমি তোর জন্যে এতটুকুন করতে পারবো না।

—তুই আমাকে হীরের খবর বলবি। মঙ্গলী দু'হাতে লোকটার গলা জড়িয়ে ধরে। চুম খায় ঘনঘন। লোকটা আহ্লাদে গলে যায়।—বল। বল। তুই আমাকে হীরের খবর দিবি।

—তোর বেদে, তার মন্তর, তোর শেকড় বাকড় যদি আমাকে পুরো-পুরি পুরুষ বানিয়ে দিতে পারে তবে আলবাৎ আমি তোকে হীরের খবর দেবো। কিন্তু মঙ্গলী হুঁশিয়ার, হীরের খবর তুই আর আমি ছাড়া কেউ জানবে না। আমি জানিরে কোথায় হীরে লুকোনো আছে। কিন্তু বস্তুটা কিরে যা আমাকে যোগাড় করে আনতে হবে।

—একটা মানুষের বাচ্চা। ফিস ফিস করে মঙ্গলী বললেও আমি বেশ পরিষ্কার শুনতে পাই। কচি বাচ্চার কথা মঙ্গলীর মুখে শুনে আমি চমকে উঠি। ভয়ে সর্বাঙ্গে কাঁটা দেয়। তাহলে অর্জুন বহিধর যা বলেছে সব সত্যি।

—কচি বাচ্চা দিয়ে কি হবে? চমকে উঠে প্রশ্ন করে লোকটা মঙ্গলীকে।—কি হবে? কি হবে? হঠাৎ হি হি করে হাসতে থাকে মঙ্গলী। মনে হয় কোনো ডাইনী হাসছে। বাবা। কী ভীষণ। ভয়ানক সে হাসি। আমার অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে ছাড়ে। বাইরে বাদলা রাত। মাঝে মাঝেই দমকা হাওয়া। বিদ্যুতের ঝিলিক। দূরে প্রধানপাত জল-ধারার অশ্রান্ত গর্জন। আশেপাশের অঞ্চলে সাপ ভেক গিলছে সম্ভবত। ভেক-এর মরণ চিৎকার। বেশ পরিষ্কার ফেউ-এর ডাক শুনতে পাচ্ছি। এ প্রেত পুরীতে কোথাও আলোর আভাস নেই। সবই কেমন যেন রহস্যময়। ভৌতিক আবহাওয়া। শরীরে ঘনঘন কাঁটা দেয়। ডাইনী হাসছে। ভীষণ ভয়ঙ্কর সে হাসি। সে একটা কচি শিশু চায়। কি করবে সে?

কি আর-করবে। যা সব সময় করে এসেছে। তাহলে অর্জুন বহিধর

যা কিছু বলেছে সব সত্যি। ওই ভীষণ দর্শন লোকটা পুরুষত্বহীন। পুরুষত্ব ফিরে পাবার জন্যে মঙ্গলীর শরণাপন্ন হয়েছে। মঙ্গলী ওঝা ডেকেছে। অরণ্যের ভেতর পূজো হবে। পূজোর উপকরণ প্রায় সমস্তই যোগাড় হয়েছে। একটা শিশুর দরকার ছিল। মঙ্গলী ওই ভীমদর্শন লোকটার সাহায্যে শিশু যোগাড় করবে। এ রকম শিশু যোগাড় সে পূর্বে অনেকবারই করেছে। গাঁয়ের কোনো ওঁরাও দম্পতির অতি আদরের, গোলগাল হৃষ্টপুষ্ট একটি শিশু। মৃত শিশুর গলায় ফুটো করা হবে আর সেই ফুটো থেকে রক্ত চুষে বের করবে মঙ্গলী। পুরুষত্ব ফিরিয়ে আনার জন্যে যে পূজো হবে তাতে দরকার হবে রক্তের। তারপর কাঁচা তরল গরম রক্ত হয়তো পান করবে ওই পিশাচী। এর আগে কতো-বারই তো সে এ কাণ্ড করেছে। লোকটা পূজো শেষে ফিরে পাবে তার পুরুষত্ব। আর মঙ্গলী পাবে তারই দৌলতে একটা সুন্দর নাদুসনুদুস শিশু। ওদের ভালবাসার ফলপ্রসু ওই শিশু। গাঁয়ের কোনো কুটিরে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে থাকবে এক ওঁরাও দম্পতি। এদিকে জঙ্গলের ভেতর মরে কাঠ হয়ে যাওয়া একটা শিশুর দেহ পড়ে থাকবে। নীল হয়ে যাওয়া দেহটা শকুনি গৃধিনী শিয়ালে টানাহেঁচড়া করবে। ডাইনীর ছেলে ছাড়াও আরো একটা বস্তুর ওপর লোভ রয়েছে। সে হলো হীরে। বামরা স্টেটের রাজধানী দেওগড় রাজবংশের পূর্বপুরুষেরা প্রাসাদের কাছে অরণ্যে হীরে লুকিয়ে রেখেছিল। কোনো সময় প্রাসাদে হয়তো ষড়যন্ত্রের ঢেউ বয়ে গিয়েছিল। সারা স্টেটে হয়তো অরাজকতা চলে-ছিল। তাই ভূগর্ভে তারা হীরেগুলো লুকিয়ে রেখেছিল। সে হীরের খবর রাখে ওই কুৎসিত কদাকার লোকটা। আর মঙ্গলী হীরের জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে। আমার মনের ভেতর সব গোলমাল হয়ে যায়। ভয়ে সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপতে থাকে। আমার এসব কিছু আর চিন্তা করতে ভালো লাগছে না। শরীরটা কেমন যেন করে ওঠে। মাথাটা ঝিম-ঝিম করছে। আমি ছাপোষা মানুষ। সংসার করি। চাকুরি করে জীবিকা নির্বাহ করি। আমার এসব এ্যাডভেঞ্চারের কোনোরকম মানে হয়

না। রহস্য উদ্ঘাটন করবার বিন্দুমাত্র উৎসাহ আমার নেই। আমি এক পা দু পা করে বারান্দা ধরে পেছোতে থাকি। একসময় ঘরে ফিরে আসি। ঘর খালি। অর্জুন বহিধর তখনো ফেরে নি। কোথায় গেল লোকটা? অত্যাধিক মদ্যপান করে গড়াচ্ছে নাকি কোথাও?

খুলেই বলেছিলাম অর্জুন বহিধরকে সবকিছু। আমার আশঙ্কা ভয় সমস্ত কিছুরই আভাস দিয়েছিলাম। অর্জুন বহিধর বলে—আমি আগেই বলেছিলাম আপনাকে ওই ওঁরাও মেয়েটার কথা। এবার দেখুন আমার কথা সত্যি কিনা। স্বীকার করতে হলো যে সবকিছুই সত্যি। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম—অর্জুনবাবু। আপনার কি কিছু করবার নেই। উত্তরে বহিধর বলেছিল—সত্যি করে বলছি, এসব ঝামেলার ভেতর জড়িয়ে পড়বার আমার মোটেও ইচ্ছে নেই। লাভ কি মশাই এসবের ভেতর নাক গলাবার। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো আপনার আমার সাজে না। আর শুধু শুধু বিপদকে ডেকে আনা। আর জানেন তো ওই লোকটার জন্যেই এ প্রাসাদের ভেতর নাচগানের বন্দোবস্ত করতে পেরেছি। স্রেফ ওর দয়ায়। ও বেঁকে বসলে মুস্কিল হতো। আর ঘণ্টা দেড়েক দুই এর মধ্যে নাচগানের দল এসে যাবে। তোফা নাচগান শুরু হবে। মদ্যপান করা যাবে। কি দরকার অন্য কিছুর খোঁজ খবর নেবার। চেপে যান মশাই। স্রেফ চেপে যান। বক্তব্য শেষ করে অর্জুন বহিধর তৃপ্তির হাসি হাসে।
—খবর এসেছে গাইয়ে বাজিয়েরা কাছাকাছি গাঁয়ে পৌঁছে গেছে। দেখবেন মশাই বাঈজী কিরকম খুপসুরত। নর্তকীর নাচ দেখলে সারা-জীবন আপনার মনে থাকবে। শুধু আপনাকে খুশী করবার জন্যে এ ব্যবস্থা। আর সব কিছু ভুলে যান মশাই। হীরে টিরে সব বাজে। ওরা দুটোই জোর নেশা করেছে। আর নেশা করে আবোল তাবোল বকছে। আপনি কিচ্ছু ভাববেন না।
আমি আর কি বলতে পারি। হয়তো বহিধরের কথাই ঠিক। আমি

বাইরে থেকে তুদিনের জন্যে এখানে এসেছি। স্থানীয় গোলমালের ভেতর আমার মাথা না গলানোই উচিত। সুতরাং চুপ করে যাই। সুন্দরী নর্তকী আর তার সাথী সঙ্গীদের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকি। অর্জুন বহিধর গ্লাসে ঘনঘন মদ ঢালতে থাকে। বাইরে ঝোড়ো হাওয়া। কিন্তু থেকে থেকে ওদের কথাগুলো আমার মনের ভেতর ঘুরপাক খেতে থাকে।

হ্যাঁ। আর একবার অন্য এক স্থানে আমার মোলাকাত হয়েছিল ওই মঙ্গলী আর অর্জুন বহিধরের সঙ্গে। সেও এক রোমাঞ্চকর ব্যাপার। লিখতে গিয়ে আমার শরীরে কাঁটা দিচ্ছে। ওদের সম্বন্ধে আবার আমাকে লিখতে হবে। পাঠক জানতে পারবেন ওদের কথা।

আরো একটু জানিয়ে রাখছি। অর্জুন বহিধর আমাকে কোণারকের যে গল্প দেওগড়ের প্রাসাদে বসে শুনিয়েছিলো তা আমি বিশ্বাস করিনি। আমি স্পষ্ট বহিধরকে বলেছিলাম যে অত্যাধিক মদ্যপানের ফলে সেদিন বহিধরের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। জেগে জেগে সে স্বপ্ন দেখেছিল। যাক্ শোনাবো আমি আপনাদের সে গল্প।

## ২

জাপানী মন্দিরের শান্ত পরিবেশে-ছেলেগুলোর-ওই হল্লা চিৎকার মাতামাতি দাপাদাপি মোটেও ভালো লাগছিল না। কলিঙ্গ নিপ্পন বুদ্ধ সঙ্ঘ কর্তৃক নির্মিত ধৌলি পাহাড়ে অবস্থিত ওই বিশ্বশান্তি স্তূপ যাকে World Peace Pagoda বলা হয় তারই আশেপাশে বসে ছেলেগুলো নানা বিষয়ে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। চারটি ছেলে একটি মেয়ে। কোথা থেকে এসেছে কে জানে। মোট কথা ওই ট্যুরিষ্ট গ্রুপটির সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক নেই। যৌবনের মূর্ত প্রতীক। উদ্দাম প্রাণ চঞ্চল যুবক আর যুবতী। একটা টেপ রেকর্ডার মেসিন চালিয়েহিন্দী ফিলমী সঙ্গীত আর ওয়েস্টার্ন মিউজিকের তালে তালে ওরা নাচছিল। ওই সঙ্গীত মন্দিরের শান্ত পরিবেশকে ভেঙে খানখান করে দিচ্ছিল। এরই ভেতর চলছিল দিল দেওয়া নেওয়ার খেলা। ধৌলিপাহাড়ের ওই নির্জন পরিবেশে ওই শান্ত সুন্দর আবহাওয়ার ভেতর ওদের এই মাতামাতি দাপাদাপি বড্ডোই অশোভন। বড্ডো বেমানান আর বেসুরো ঠেকছিল। একদিন ওই ধৌলি প্রান্তরে ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছিল। ওরা কি এই বুদ্ধ মন্দিরের ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন নয়। ওরা কি এখানকার গাম্ভীর্যকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে? ওরা কি ধৌলি পাহাড়ের ইতিহাস সম্বন্ধে সচেতন নয়। হালকা ঠুনকো কথায় ওরা মেতে উঠেছে। ওরা কি কিছু শুনতে চায় না। বুঝতে চায় না। জানতে চায় না।

ওরা যদি ধৌলি প্রান্তরের ইতিহাস শুনতে চেষ্টা করতো, বুঝতে চেষ্টা করতো, জানতে চেষ্টা করতো, যৌবনের জয়ধ্বজা উড়িয়ে চারটি যুবক একটি যুবতী, তারুণ্যের জয়োল্লাসে সোচ্চার। চারটি ছেলে এই মুহূর্তে একটি মেয়ের সঙ্গে নিবিড় হতে চাইছে। এই মনোরম পরিবেশের

ভেতর কিন্তু মেয়েটি নিবিড় হতে চায় মাত্র একজনের সঙ্গে। যদিও চারজনের সঙ্গেই সে প্রচুর উদ্দীপনা আর উৎসাহ নিয়ে মেতে উঠেছে। ওদের দৃষ্টি সামনের দিকে। পেছনের দিকে নয়। পথ ওদের টেনেছে। পাখনা মেলে ওরা উড়ে চলেছে। যৌবনের জোয়ারে ওরা ভেসে যাচ্ছে। ভোগেই ওদের তৃপ্তি। জীবনটা তুদিন বইতো নয়। হেসে খেলে নাও।

এদের অশান্ত যৌবনের মাতামাতি দেখে বাকী মনুষ্যগুলো অবাক বিস্মিত। কারু মনে ঘৃণা। কারু দ্বেষ। কারু হিংসা। কেউ কেউ ওদের করুণা করছে বৈকি।

কিন্তু জাপানী মন্দিরের দর্শনার্থীদের প্রত্যেকেরই দৃষ্টি ওদের ওপর পড়েছে। ওরা বেপরোয়া। অন্যদিকে দৃষ্টি দেবার সময় নেই ওদের। ওরা নিজেদের ভেতর চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। মেয়েটিকে ওদের চারজনার ভেতর একজনকে বেছে নিতে হবে। মাত্র একজনকে বেছে নিতে হবে! মেয়েটির ওপর সেরকম আদেশই হয়েছে। একজনকে বেছে নাও। যাকে তোমার খুশী। আজ সন্ধ্যায় সেই পাবে তোমার সঙ্গ সুখ। অন্য কোনো সন্ধ্যায় অন্য কাউকে তুমি বেছে নিও। আজ শুধু একজনার জন্যেই এই সন্ধ্যা। ওদের চিন্তাভাবনার আকাশে নিত্য নতুন মেঘ। আর তাই মেঘের ওপর নিত্য নতুন নতুন রঙের আলপনা। এ এক ভিন্ন ধরনের খেলা। নতুন ধরনের উত্তেজনা।

মহাভারতে উল্লেখ রয়েছে যে কলিঙ্গ নৃপতি নিজ কন্যার জন্যে স্বয়ংবর সভার আয়োজন করেছিল। কিংবদন্তী প্রচলিত যে স্বয়ম্বরা সভায় বহু দূর দূর দেশ থেকে জাঁদরেল নৃপতিরা এসেছিল। নৃপতিদের আগমনে আসর ছিল জমজমাট। জমকালো পোষাক পরিচ্ছদ পরিহিত সঙ্গী সাথী অনুচর সৈন্য সামন্ত নিয়ে বীর মহারথীরা পৌঁছে গিয়েছিল কলিঙ্গ দেশে। রাজকন্যা কার গলায় মালা প্রদান করে সে সম্বন্ধে কেউ নিশ্চিত নয়। সবাইকার বক্ষ তুরু তুরু। কিন্তু বাইরে সে ভাব দেখানো চলবে না। নৃপতিসকল গোঁফ চুমরাচ্ছে ঘন ঘন।

নৃপতিদের মধ্যে রয়েছে, শিশুপাল ভীষ্মক, বক্র, দুর্যোধন, কর্ণ প্রভৃতি। দুর্যোধন পরম পরাক্রমশালী। আর সে নিশ্চিন্ত যে কন্যা তার গলায়ই মালা অর্পণ করবে। বধূ বেশে রাজকন্যা ঘুরে ঘুরে নৃপতিদের দেখছে। গোঁফে তা দিচ্ছে অন্যান্য রাজারা। কন্যা এগিয়ে গেল দুর্যোধনের দিকে। একটু মুচকি হেসে গোঁফ চুমড়িয়ে দুর্যোধন প্রস্তুত। তার বিশ্বাস কন্যা গলায় নির্ঘাত মালা পরিয়ে দেবে। আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মাথা নোয়ালো দুর্যোধন। অতিমাত্রায় নিশ্চিন্ত সে। ও হরি ! কোথা দিয়ে কি হলো কে জানে। আর স্ত্রী-মন বোঝা দুষ্কর। মেয়ে অনায়াসে দুর্যোধনকে অবজ্ঞা দেখিয়ে দ্রুতপদে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। উপেক্ষা করলো তাকে অনায়াসে। কন্যার পছন্দ হয় নি দুর্যোধনকে। পছন্দ হয়নি তার জাঁকআর দম্ভ। অসহ্য এ উপেক্ষা। ক্রোধে অন্ধ হয়ে দুর্যোধন গাত্রোত্থান করে লাফিয়ে গিয়ে ধরলো কন্যার হাত। তারপর বলপ্রয়োগ করে কন্যাকে নিয়ে গিয়ে তুললো তার রথে। বাদ বাকী নৃপতিরা ততক্ষণে স্তম্ভিত বিস্মিত। অসি কোষ থেকে মুক্ত করে তারা এগিয়ে গেল। দুর্যোধনকে শাস্তি দেবার জন্যে। দুর্যোধনের পক্ষ আগেভাগে প্রস্তুত ছিল। তারা বাধা দিল। যুদ্ধ বেধে ওঠবার আগেই দুর্যোধন মেয়েকে নিয়ে অনায়াসে চম্পট দিল। কলিঙ্গ নৃপতির বুদ্ধি, চেষ্টা উদ্যম এবং মধ্যস্থতায় সব কিছু মিটে গেল। সেবার দুর্যোধন অনেক কষ্টে মান সম্মান নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়েছিল। সেবার তাকে পালাতে সাহায্য করেছিল কলিঙ্গ নৃপতির বুদ্ধি ও কৌশল এবং কর্ণের বিক্রম আর তার রণনিপুনতা। দুর্যোধন অনায়াসে সে যাত্রা হস্তিনাপুর পৌঁছে গেল। কলিঙ্গ কন্যার সঙ্গে দুর্যোধনের বিয়ে হয়ে গেল। সম্পর্ক স্থাপিত হলো কলিঙ্গ আর হস্তিনাপুরের মধ্যে। আর এরই ফলস্বরূপ দেখতে পাই মহাভারতের যুদ্ধের সময় কলিঙ্গ সৈন্য যোগ দিয়েছিল দুর্যোধনের পক্ষে। কলিঙ্গ নৃপতি যুদ্ধ করেছিল পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে। ধৌলি পাহাড়ে সেদিন চারটি যুবক স্থির করেছিল কন্যাকে তাদের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হবে। সে সন্ধ্যা হবে সে যুবকের কন্যা

যাকে বেছে নেবে।

—আমি এ মুহূর্তে অরুণাংশুকে বেছে নিলাম। বললে সুমিত্রা। কোষ-বদ্ধ অসি নিষ্কাষিত হলো না। কয়েকটি কণ্ঠ এক সঙ্গে গর্জে উঠলো না। ঝগড়া বিবাদের আঁচটিও কেউ অনুভব করলে না। সুমিত্রার রায় সবাই মাথা পেতে নিলো।

—আমি ইতিহাস পালটিয়ে দিলাম। স্ব-ইচ্ছায় বর্ত্তমান কালের তুর্যো-ধনকে বেছে নিলাম। হাসতে হাসতে বললে সুমিত্রা।

—আমরা কেউ বাধা দেবো না। নতুন যুগে নতুন ইতিহাস গড়তে চলেছি আমরা। সম্মিলিত কণ্ঠে ওরা সবাই বলে উঠলো।

—আজকের রাতটা সুমিত্রা থাকবে অরুণাংশুর সঙ্গে। চুলে চিরুণী চালাতে চালাতে বলে নিরুপম।

—সুমিত্রা দেখো তোমার ভালবাসা শেষ পর্যন্ত যেন ওর পক্ষে অসহ্য না হয়। গোঁফ আর জুলফি ঠিক করতে করতে বলে বিভাস।

—এমন ভালবাসা তুমি বিলোবে সুমিত্রা যেন এ রাতটা অরু-ণাংশুর চিরদিনের জন্যে মনে থাকে। আমরা কেউ থাকবো না। এই ধৌলি প্রান্তরে যতক্ষণ খুশী তোমরা প্রেমপ্রেম খেলা খেলতে পারো। বলে অভিলাষ।

—আজ সন্ধ্যায় তোমরা কি করবে ? প্রশ্ন করে সুমিত্রা।

—আকাশের তারা গুণবো। বলে নিরুপম।

—অশোকের শিলালিপিতে খোদাই করা বাণী মশাল জ্বেলে পাঠ করবো। বলে বিভাস।

—বুদ্ধের উপাসনা করবো। বলে অভিলাষ।

মাটি আর প্রান্তর। ওরা পাশাপাশি।

ধৌলি প্রান্তর বড়ই স্মরণীয়। আর রমণীয় এ নারী। কেবল রক্ত মাংস মেদ মজ্জা। ধৌলি প্রান্তরে সন্ধ্যা নেমে আসবে ধীরে ধীরে।

ওরা তু'জনে পাশাপাশি শুয়ে আছে। অরুণাংশু বলে—তুমি আমাকে ভালবাসো ?

—না ভালবাসলে তোমাকে সবাইকার ভেতর থেকে বেছে নিলাম কেন ? বলে সুমিত্রা। তার হৃৎপিণ্ডের ওপর হাতুড়ির ঘা পড়ছে।
—আমি তোমাকে ভালবাসি। ধীরে ধীরে বলে অরুণাংশু।
—আমিও তোমাকে ভালবাসি। নিজের কথাগুলো নিজের কাছেই কেমন যেন বেমানান ঠেকছে সুমিত্রার। অদ্ভুত একটা যান্ত্রিক ধ্বনির মতোই। ওরা পড়ে আছে বড্ডো কাছাকাছি। পাশাপাশি। সঙ্গোপনে, একান্তে, নিভৃতে, নির্জনে, লোকচক্ষুর অন্তরালে। ওরা কথা বলছে না। প্রেমগুঞ্জন করছে। অরুণাংশুর মনে আগুন জ্বলছে।
—তুমি সাহসী নারী। কজন নারী তোমার মতো হয়।—তুমি সাহসী পুরুষ। সমস্ত প্রান্তরটা অন্ধকারে ঢেকে ফেলেছে। সুমিত্রা অরুণাংশুর বুকের ওপর পড়ে থেকে কান পেতে শোনে ওর বুকের ধুকধুকানি। অরুণাংশু নীরবে আঙুল চালায় সুমিত্রার চুলের ভেতর। পরম স্নেহে।
—তোমার মনে পড়ে সুমিত্রা, ভুবনেশ্বরে মুক্তেশ্বর মন্দিরে অশ্বারূঢ় রমণীকে ?—মনে পড়ে। অতি আস্তে জবাব দেয় সুমিত্রা।
—ওই নারীমূর্তির স্থলে আমি তোমাকে কল্পনা করেছিলাম।
—জানো ভুবনেশ্বর মন্দিরের প্রাচীন শিল্পকলা মনটাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। লিঙ্গরাজ মন্দিরে শিল্পী মানবমনের বেদনা, হতাশা, ব্যথা, অস্থিরতা অতি সুন্দরভাবে মন্দির গাত্রে ধরে রেখেছে। সেখানেই দেখলাম এক সৈনিক তার সুন্দরী যুবতী স্ত্রীর কাছ থেকে যুদ্ধে যাবার পূর্বে বিদায় নিচ্ছে। বিদায় ক্ষণে দু'জনের অন্তরের বেদনাটুকু মূর্ত হয়ে উঠেছে দু'জনার মুখমণ্ডলে। লক্ষ্য করেছিলে তুমি ?
—করেছিলাম। বলে অরুণাংশু।
সুমিত্রার নিজের কথাগুলো নিজের কাছে বড্ডো বেমানান ঠেকছে। কথাগুলো মগজের ভেতর ঢুকে সবকিছু যেন কুরে কুরে খাচ্ছে।—
—তুমি এদের ত্যাগ করে শুধুমাত্র আমাকে নিয়ে পালিয়ে এলে কেন ? প্রশ্ন করে অরুণাংশু।—কেন এলাম। তোমাকে ভালবাসি। আর তোমার কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলাম। তাই এলাম।

শান্তিস্তূপে ওরা যেন আজ বড্ডো বেশী মাতামাতি করছিল। বড্ডো বেশী হৈ হুল্লোড়। প্রয়োজন ছিল কি অতটা ছেলেমানুষীর। আমাদের কি শোভা পায় অতটা ছেলেমানুষী? তুমিই বলো। বড্ডো বেমানান। বড্ডো বেখাপ্পা। বলো সুমিত্রা।

—হয়তো ওর অনেকটাই নকল। কৃত্রিম। হয়তো লোক চক্ষুকে ফাঁকি দেবার জন্যে সবকিছুর আয়োজন। জানো সুমিত্রা পুরাণে বর্ণিত পরশুরাম সেই ব্রাহ্মণ বীর তাঁর শেষ দিনগুলো দক্ষিণ উড়িষ্যার মহেন্দ্রগিরিতে কাটিয়েছিলেন। আমাদের হাত রক্তরাঙা। আমাদের মনে অনেক পাপ জমেছে। কবে আমরা পাপ মুক্ত হবো বলতে পারো। অরুণাংশুর বুকের উপর রয়েছে সুমিত্রার মাথা। অরুণাংশু সুমিত্রার মুখখানা কাছে টেনে এনে আলতোভাবে একটি মৃদু চুম্বন ওর গালে এঁকে দেয়।

পাণ্ডব ভ্রাতারা তাদের সঙ্গিনী দ্রৌপদীকে নিয়ে উৎকলের অরণ্য প্রান্তর অতিক্রম করে বৈতরণীর পুণ্য স্রোতে অবগাহন করে পাপমুক্ত হতে চেয়েছিলেন। পরে ওঁরা পুরীর কাছে সমুদ্রে অবগাহন করে আরো অনেকটা পুণ্য সঞ্চয় করেছিলেন। আমাদের হয়তো পাপপুণ্যের হিসেব নিকেশ করবার সময় এখনো হয়নি। বলে সুমিত্রা—সুমিত্রা বলতে পারো আমাদের এ আদর সোহাগ ভালবাসা কতোটুকু সময় টিকে থাকবে। ভোরের আলো ফুটবার আগেই ধৌলি প্রান্তর থেকে আমাদের বিদায় নিতে হবে। আবার শুরু হবে অনির্দিষ্ট যাত্রা। অরুণাংশুর কণ্ঠ-স্বরে পড়েছে বিষাদের প্রলেপ।

—সত্যি তাই। বলো সুমিত্রা।

—নগরে শোনা যাবে কোলাহল। প্রান্তরে নামবে পূর্ণিমা সন্ধ্যা। বনস্থলী ভরে উঠবে কলকাকলীতে। ধানের শীষে শিশিরবিন্দু জমা হবে। চরণরেখা ফেলে চলে যাবে গোপালক। থেমে যায় অরুণাংশু।

—তুমি জাতে পুরোপুরি কবি। বলে সুমিত্রা।

—হ্যাঁ। তাই। চেষ্টা করলে ফল কুড়োতে পারতাম। ইউনিভার্সিটিতে অনেক কবিতা লিখেছি। গল্প উপন্যাসের সংখ্যাও কম নয়। তখন

মনস্থির করে উঠতে পারিনি, ঔপন্যাসিক হবো না কবি হবো ? তারপর ঝড় উঠলো। ঘুর্ণিঝড়। কোথা দিয়ে যে কি ঘটে গেল। কথা শেষ করে ছোট্ট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অরুণাংশু। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা। প্রান্তরে নেমে এসেছে গভীর অন্ধকার। ফিকে জ্যোছনার আভাস যেন। অরুণাংশুর বুকে মাথা দিয়ে পড়ে আছে সুমিত্রা। হঠাৎ অরুণাংশু সুমিত্রাকে সরিয়ে দিয়ে লাফিয়ে উঠে পড়ে। দূরে একখণ্ড জমাট অন্ধকার যেন সহসা সচল হয়ে উঠলো। মুহূর্তে পকেট থেকে রিভলবার বের করে অরুণাংশু। গুলীভরা রিভলবারটা সে বাগিয়ে ধরে। সচল অন্ধকারের স্তূপটাকে লক্ষ্য করে সে রিভলবারটা তাক করে। অন্ধকারের খণ্ডটুকু পাশের ঝোপের ভেতর অদৃশ্য হয়।

—মানুষ। রুদ্ধশ্বাসে বলে সুমিত্রা।

—মনে হচ্ছে না। জবাবে বলে অরুণাংশু।

—তাহলে হায়না বা নেকড়ে। বলে সুমিত্রা।

—অসম্ভব নয়। শেয়ালও হতে পারে।

খানিকটা সময় নিস্তব্ধতা।

—জানো অরুণাংশু। শান্তিস্তূপ ট্যুরিষ্টের দলটার ভেতর কাউকে কাউকে আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছিল।

—আমারও তাই মনে হয়েছে। জবাব দেয় অরুণাংশু। আবার খানিকটা সময় নিস্তব্ধতা। আবার ওরা শোয় পাশাপাশি।

—জানো সুমিত্রা। আমার মনে হচ্ছে আমি, নিরুপম, বিভাস, অভিলাষকে প্রবঞ্চনা করে ওদের কাছ থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছি। বলতে পারো ওদেরকে আমি বঞ্চিত করেছি।

—না এ বঞ্চনা নয়। তুমি আজ রাতে বিজয়ী। ওরা পরাজিত। বলে সুমিত্রা।

—না না। এ কথা ঠিক নয়। আজ সন্ধ্যেটা ওরা নিজেদের সংযমের রশিতে বেঁধে রেখে আমাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। ওরা মনের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী। আর আমি মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাজিত। আজ সে রাত্রি

যে রাত্রিতে সুমিত্রা তুমি দলচ্যুত হয়ে সবার থেকে আলাদা হয়ে আমার সঙ্গে চলে এসেছো। বলে অরুণাংশু। সুমিত্রার ঘন সান্নিধ্যে অরুণাংশুর দেহ শিহরিত হচ্ছে। সুমিত্রার তপ্ত নিশ্বাস পড়ছে অরুণাংশুর মুখে চোখে গালের ওপর। সুমিত্রা নিজের মুখটা তুলে এনেছে অরুণাং-শুর মুখের খুব কাছাকাছি। এ্যাক্রোবেটিক, ট্রাপিজ, হরাইজেণ্টাল বার প্রভৃতি নানাবিধ ক্রীড়া কৌশলে রপ্ত শক্ত সামর্থ সুগঠিত দেহটা বার বার কেঁপে উঠছে কেন? অরুণাংশু হাত দিয়ে সুমিত্রার মাথাটা নামিয়ে আনে। তারপর ওর ঠোঁট দুটো নিজ ঠোটে চেপে ধরে। তারপর চুমোয় চুমোয় সারা মুখটা ভরিয়ে তোলে। সুমিত্রার দেহটা লতার মতো কাঁপতে থাকে। স্পর্শ, ঘ্রাণ। এক বিচিত্র অনুভূতি।

—তোমার হাতের কাছে থাকা লেডিজ ব্যাগটা লক্ষ্মী খানিকটা দূরে সরিয়ে রাখো। আমার অসুবিধে হচ্ছে। বলে অরুণাংশু।

—না। ওটা হাতের কাছেই থাক। তোমার রিভলবারটা পকেট থেকে বের করে খানিকটা দূরে রেখে দাও। আমার দেহ ওটা বারেবারে স্পর্শ করছে। অরুণাংশু রিভলবারটা বের করে খানিকটা দূরে মাটিতে রেখে দেয়। সুমিত্রা ওটাকে বেশ খানিকটা দূরে সরিয়ে রাখে।

—জানো লোডেড রিভলবারটা এ মুহূর্তে বড্ডো বেমানান। এ সুন্দর পরিবেশে বড্ডো অশোভন।

—সুমিত্রা, তোমার চুল আজ উসকোখুসকো কেন? চোখ দুটো লাল। তোমার পরনে নেহাত সাদামাঠা শাড়ী। জলছোপ। বড়ই নগন্য বেশে তুমি আমার কাছে এসেছো সুমিত্রা।

—ড্রেস আর মেক আপে আমার মোটেও বিশ্বাস নেই। ওসব নিয়ে আমি মন ভোলাতে চাই নে!

—তবুও আজ সন্ধ্যেবেলার বেশভূষার দিকে খানিকটা নজর দিলে এমন কি আর ক্ষতি হতো। একটা রাত বইতো নয়। দরকার ছিল তোমার উদ্যমের। তৃপ্ত হতাম আমি।

—জানো অরুণাংশু। কাল সারারাত আমি ঘুমুতে পারি নি। গলা

কাঠ। হাত পা কাঁপছিল। এখনো মাথায় বড্ডো যন্ত্রণা।
—রক্তচাপ বৃদ্ধি না দুর্বলতা।
—বোধ করি দুর্বলতা।
—সুমিত্রা মদ খাবে ? শরীরটা তোমার সহজেই চাঙা হয়ে উঠবে।
—এখানে মদ কোথায় পাবে ?
—ভুবনেশ্বরে এক দোকানে খোঁজ পেয়েছি। ভালো বিলিতী বস্তু। কাল তোমাকে মদ খাওয়াবো।
—ও বস্তুটার ওপর আমার মোটেও আসক্তি নেই। আর কালকের কথা বলছো। কাল মুড কি রকম থাকে কে জানে। সুমিত্রার হঠাৎ একটা আনমনা ভাব!
একটু সময় নিস্তব্ধতা। তারপর সুমিত্রা হঠাৎ বলে—অরুণাংশু তুমি কি গতকাল ভুবনেশ্বরে মদের খোঁজে গিয়েছিলে ?
—না। অরুণাংশু সঠিক জবাব দেয় না। হ্যাঁ-নার দোলায় দুলতে থাকে।
—আমি জানি কাল দুপুরে তুমি একলা ভুবনেশ্বর পরিভ্রমণে বেরিয়েছিলে। গিয়েছিলে সবাইকার অলক্ষ্যে অজান্তে।
—তুমিও তাহলে ভুবনেশ্বরে গিয়েছিলে ? অরুণাংশু খানিকটা চমকে ওঠে। ওর ব্যগ্র কণ্ঠস্বর।
—হ্যাঁ গিয়েছিলাম। নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দেয় সুমিত্রা।
—কোথায় দেখতে পেলে আমাকে ?
—বাস স্টেশনে। জবাব দেয় সুমিত্রা।
—তুমি কি ভেবেছিলে ভুবনেশ্বর ছেড়ে চলে যাচ্ছি আমি। তোমাদের সবাইকে ছেড়ে পালাচ্ছিলাম আমি। অরুণাংশুর কণ্ঠ থেকে শ্লেষ জড়ানো কথাগুলো বেরিয়ে আসে।
—না। না। আমি ভাবছিলাম যদি কোনো বিপদ আপদ হতো। তোমার যে মদ্যপানের ইচ্ছা প্রবল হয়েছিল সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত।
—হয়তো তোমার কথাই ঠিক। তবে জেনে রাখো এ শর্মা সর্বদা সতর্ক অবস্থায় চলাফেরা করে। সমস্ত কিছুর জন্যে সে প্রস্তুত।

--তবুও বলা যায় না। বিপদ সর্বক্ষণ ওৎ পেতে বসে থাকে। শুধু ঝাঁপিয়ে পড়বার অপেক্ষা।

--বৈকুণ্ঠদের দলটা শুনেছি আমাদের সঙ্গে ভুবনেশ্বরে মিলিত হবে। হয়তো হবে। হয়তো বা হবে না। ওদের জন্যে আমার বিশেষ আগ্রহ নেই।

—ওদের সঙ্গে মালতী আসছে। বলে অরুণাংশু।

—তুমি নতুন সঙ্গিনী পাবে' এবার সুমিত্রা ঠাট্টার ছলে কথাগুলো বলে।

—মালতীর সঙ্গ কি তোমার চেয়ে বেশী মধুর। অরুণাংশু কথার তীক্ষ্ণ-বান ছুঁড়ে দেয়।

—সে তুমি বলতে পারবে। চটপট জবাব দেয় সুমিত্রা।

—মালতী বড্ডো ঠাণ্ডা। কেমন যেন জলো জলো ঠেকে। উত্তাপের অভাব। আচ্ছা সুমিত্রা ভালো লাগে তোমার এ জীবন।

—কেন তোমার বুঝি ভালো লাগছে না এ জীবন। তুমি কি ছোট্ট একটি সুন্দর সংসারের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছো অরুণাংশু।

—না। কেমন যেন চমকে ওঠে অরুণাংশু।

—কেন স্বপ্ন দেখতে দোষ কি? সেটাই তো স্বাভাবিক। বলে সুমিত্রা।

--না। না। আমাদের পক্ষে ওটা অস্বাভাবিক। স্বপ্ন দেখতে নেই। স্বপ্ন দেখাও পাপ। আচ্ছা সুমিত্রা মাতৃত্বের জন্যে তোমার মন কাঁদে না?

—উহুঁ। না। জানো অরুণাংশু মাথার বড্ডো যন্ত্রণা হচ্ছে। শরীরটা ভালো ঠেকছে না।

—মাথা টিপে দেবো? প্রশ্ন করে অরুণাংশু।

—তোমার দু'হাত দিয়ে আমার মাথাটা টিপে দাও। কপালের দুটো দিক তোমার আঙুল দিয়ে টিপে ধরো। কখন যে মুক্তি পাবো এ যন্ত্রণা থেকে। আমি ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে দুটো ট্যাবলেট বের করে নিচ্ছি। অরুণাংশু তার হাতের আঙুল দিয়ে সুমিত্রার কপালের দুপ্রান্ত টিপে ধরে।

ধৌলিপ্রান্তরে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে অরুণাংশু। সুমিত্রা অরুণাংশুর দিকে পেছন ফিরে বসে ব্যাগের ভেতর কি যেন খুঁজছে। অন্ধকারে ব্যাগের ভেতর থেকে ট্যাবলেটের পরিবর্তে সুমিত্রা ছোট্ট একটি রিভলবার বের করে আনে। দলের সবাই মিলে রায় দিয়েছে অরুণাংশু বিশ্বাসঘাতক। ওকে কিছুতেই বেঁচে থাকতে দেওয়া হবে না। অরুণাংশু বিশ্বাসঘাতক। সে ভুবনেশ্বরে পুলিশের লোকের কাছে সব কিছু ফাঁস করে দেবার জন্যে গিয়েছিলো। অরুণাংশু ভুবনেশ্বরে দেখেছে সুমিত্রাকে। দেখেছে বিভাসকে। তাই সে নিঃশব্দে ওখান থেকে পালিয়ে এসেছে। পুলিশের লোকের কাছে কিছু বলে দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। অরুণাংশুকে খতম করবার ভার পড়েছে সুমিত্রার ওপর। সুমিত্রা তাই অরুণাংশুকে ভুলিয়ে নির্জন প্রান্তরে নিয়ে এসেছে। এতোক্ষণ সুমিত্রা নিখুঁত অভিনয় করেছে।

সুমিত্রা উঠে দাঁড়ালো। কয়েক পা সামনের দিকে এগিয়ে গেল। টোটা ভরা পিস্তলের ঘোড়া টিপলো। এরপর একটা শব্দ। আগুনের ঝিলিক। খানিকটা ধোঁয়া। গোটা দুই আর্ত চিৎকার। মনে হচ্ছে প্রথম গুলী তলপেটে বিদ্ধ হয়েছে। দৌড়ুবার আগে দ্বিতীয় গুলী। সুমিত্রার হাত কেঁপেছিলো প্রচণ্ড ভাবে। হয়তো এ গুলীটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। বলা যায় না। লাগতেও পারে। তীব্র চিৎকারের পর অরুণাংশু যন্ত্রণায় গড়াচ্ছে। কাতরাচ্ছে। আর সুমিত্রা তার দৌড় শুরু করেছে।

বুকের কোটরে এক অব্যক্ত ব্যথা। রক্তের ভেতর দাপাদাপি। মাতামাতি। অল্পক্ষণের ভেতরই সব শেষ হয়ে যাবে। একটি মধুর সন্ধ্যা। একটি তৃপ্তিদায়ক রাত্রি এভাবে শেষ হবে। প্রথমে স্মৃতি। শুধু স্বপ্ন তারপর বিস্মৃতি। প্রথমে খানিকটা মায়া। খানিকটা মতিভ্রম। পাপপুণ্যের চুলচেরা বিচার করতে গিয়ে খানিকটা সময়ের জন্য মুহ্যমান অবস্থা। সুমিত্রার মস্তিষ্কের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এক অব্যক্ত যন্ত্রণা। সুমিত্রা দৌড়ুচ্ছে। কাঁটা, ঝোপ, পাথর, কাঁকর, রুক্ষ মাটির ওপর দিয়ে প্রাণপণ বেগে দৌড়ুচ্ছে সুমিত্রা। উপায় ছিল না কোনো। বিশ্বাসঘাতকের

শাস্তি মৃত্যু। দলপতির তাই আদেশ। আর আদেশ সুমিত্রাকে পালন করতেই হবে।

সুমিত্রার দেহটা থর থর করে কাঁপছে।

শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার। অন্ধকারে বা প্রান্তরের মাটির ঢিপিতে হোঁচট খেয়ে ছিটকে পড়লো সুমিত্রা। আবার সে উঠে দৌড়ুলো। অরুণাংশু এই মুহূর্তে কি করছে। হয়তো যন্ত্রণা জ্বালায় ছটফট করছে। গোঙাচ্ছে। কতোক্ষণ গোঙাবে কে জানে। এক সময় ওর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থেমে যাবে। নীরব নিথর দেহটা পড়ে থাকবে। শেয়ালগুলো হাত পা ধরে টানাটানি শুরু করবে। শকুন গৃধিনী দেহটা ঠুকরে ঠুকরে খাবে। অরুণাংশুর আদরটা সুমিত্রার সারা শরীরে এখনো জড়িয়ে রয়েছে। আবেশে বুঝি সে এখনো বিহ্বল। অরুণাংশু ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ে আছে। অভিমান অনাদর নিয়ে পড়ে আছে। সে অসহায়, পঙ্গু। দুর্বল। রক্তের সঙ্গে হয়তো অশ্রু ঝরছে। চাপ চাপ রক্তে ঘাস ফুল প্রান্তর রক্তিম হয়ে উঠবে। ভোরের আলো স্তম্ভিত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকবে। দোয়েল কোয়েল কলকাকলি ভুলে স্তব্ধ হয়ে থাকবে। ওর প্রেম আততায়ীর গুলীতে ছিন্ন ভিন্ন। কি আশ্চর্য। সুমিত্রা কেন দৌড়ুতে পারছে না। মনে হয় স্ক্রু দিয়ে ওর পা দুটো কেউ মাটির সঙ্গে আটকিয়ে দিয়েছে। অতিকষ্টে সে দেহটা টেনে নিয়ে চলেছে। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে সামনে এক অতলস্পর্শী খাদ। তাকে গিলে খাবার জন্যে হাঁ করে আছে। আর সুমিত্রা বার বার ভুল করে আঁতকে উঠে সভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে। এগুবার সাধ্য নেই সুমিত্রার। সামনে অতলস্পর্শী খাদ। বঙ্কিম দুরূহ পথ। দিশেহারা হয়ে দৌড়ুলেও সারারাতে সে এ ভয়ঙ্কর প্রান্তরটা পার হতে পারবে না। ধূসর অন্ধকার প্রান্তরটা এক ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে।

অন্ধকার কাঁপছে।

ঝোপঝাড় কাঁপছে। সব কিছু কাঁপছে থর থর করে।

সঙ্গে সঙ্গে সুমিত্রার দেহটা কাঁপছে। সুমিত্রাকে একরাশ ক্লান্তি শ্রান্তি

ঘিরে ধরেছে। অরুণাংশু কি সত্যি তাকে ভালবাসতো ? না কি সবকিছু ভড়ং ? দলের বাদবাকীরা। নিরুপম, বিভাস আর অভিলাষ। মনে হয় ওদের মধ্যে একমাত্র অরুণাংশু সংসারের স্বপ্ন দেখত। বারাসতের বাগান বাড়িটা যখন পুলিশ ঘিরে ফেলেছিল তখন মৃত্যুকে উপেক্ষা করে পুলিশের চোখ এড়িয়ে সুমিত্রাকে সঙ্গে নিয়ে অরুণাংশু সমস্ত বিপদ আপদ তুচ্ছ করে গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে পালিয়েছিল। কেউ কেউ ধরা পড়েছিল। ওরা পালিয়ে বেঁচেছিল। ওদের মাথার ওপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে পুলিশের গুলী চলে গিয়েছিল। তবুও দলের সবাই আজ রায় দিলে অরুণাংশু বিশ্বাসঘাতক। প্রতারণার খেলা চালাচ্ছে —অরুণাংশু।

দলপতি নাকি একদিন দেখেছে ভুবনেশ্বরের পুলিশ থানার কাছে অরুণাংশুকে ঘোরাফেরা করতে। ভুবনেশ্বরে অরুণাংশু গিয়েছিল পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। ওরা অনেকদিন থেকে অরুণাংশুকে সন্দেহ করে আসছিল। তাই ওর পেছনে স্পাই ঘুরতো। দলের সবাই ধীরে ধীরে অরুণাংশুর ওপর বিশ্বাস হারাচ্ছিলো। ভুবনেশ্বরে তাই দলের লোক অরুণাংশুর পেছন পেছন ঘুরছিল। অরুণাংশু বোধ করি কিছু কিছু টের পেয়েছিল।

সম্প্রতি সে স্বপ্ন দেখছিল এক সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের। স্বপ্ন দেখছিল একটি ছোট্ট সংসারের। কিন্তু তা হবার নয়। এ পথে এলে পেছনের দরজা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়। ফিরে যাওয়া মুস্কিল। সুমিত্রার ওপর আদেশ হলো ওকে হত্যা করবার জন্যে। ওই জঘন্য কাজটা শেষ পর্যন্ত সুমিত্রাকেই করতে হলো। উপায় ছিল না। দলপতির আদেশ। সুমিত্রাকে পালন করতেই হবে। না হলে তাকেও মৃত্যুবরণ করতে হবে।

অরুণাংশু শুয়ে আছে।

দু হাত দিয়ে পেটটা চেপে সে পড়ে আছে।

আঙুল চুঁইয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে মাটিতে।

তৃষ্ণার্ত প্রান্তর সে রক্ত শুষে নিচ্ছে। ধৌলি প্রান্তর একদিন কতো রক্তই না শুষে নিয়েছিল।

অরুণাংশু ভাবে আশ্চর্য এখনো মৃত্যু হয়নি তার। গুলীটা কি মোক্ষম স্থানে লাগে নি। গুলী ছুঁড়বার সময় সুমিত্রার হাত কি কেঁপেছিল? পেটে অসম্ভব যন্ত্রণা। তবুও অরুণাংশু বেঁচে আছে। মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছে অরুণাংশু!

আকাশে সপ্তর্ষির চিহ্ন নেই। হাওয়া বইছে।

চারদিকে কেমন একটা গুমোট ভাব। সুমিত্রাকে এ মন্ত্রে সে প্রথম দীক্ষিত করেছিল। না। মনে তার কোনো আফশোষ নেই। ফুলগুলো ফুটে আবার মরে গেছে। ঝরে গেছে। তারাগুলো জ্বলে জ্বলে ক্ষয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ মেঘের আড়ালে আত্মগোপন করেছে। লজ্জায় ক্ষোভে কি? যে কয়েকটা তারা আত্মগোপন করে নি তারা মৌন ক্ষোভে লজ্জায় ঘৃণায় নির্বাক। তামসী রাত্রি উদাসী আকাশের কণ্ঠ-লগ্ন হয়ে থর থরিয়ে কাঁপছে। যন্ত্রণায় কাতর অরুণাংশু। এক হাতে ক্ষতটা চেপে ধরে অন্য হাত দিয়ে মুঠো মুঠো ঘাস ওপড়াচ্ছে সে। যন্ত্রণা রুখবার চেষ্টা, না নির্মম প্রতিশোধ আকাঙ্ক্ষায় ঘাস লতা পাতা তৃণ দলিত মথিত করছে? দেহের সঙ্গে সঙ্গে যৌবন প্রেম ভালবাসা ধৌলি প্রান্তরে মাটি চাপা পড়ুক। রুধিরে আপ্লুত হয়ে পড়ে থাক একটি শরীর। যে পথ ধরে সে চলেছিল সে পথে প্রেম ভালবাসার কোনো স্থান নেই। দলের কারুরই ও সবে বিশ্বাস ছিল না। তবু আজকের এ দুর্বলতার জন্যে অরুণাংশু নিজেকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছে না। হিংসা, দ্বেষ, ছলনা, ক্রুরতা, নির্মমতা নিষ্ঠুরতার ভেতর এ কোমলতা, এ প্রেমখেলা কিছুতেই শোভনীয় নয়।

মানুষ মানুষকে বাঁচতে দেবে না। অরুণাংশুর পচা গলা দেহটা বিকৃত অবস্থায় পড়ে থাকবে। অফিসে কেরাণী কাজ করবে। মাঠে চাষী লাঙ্গল চষবে। স্বামী স্ত্রী হাসবে। কাঁদবে। প্রেম করবে। সব কিছু ঠিক থাকবে। শুধু অরুণাংশু থাকবে না।

সে কি ভুল পথে চলেছিল?

সে সব কথা এ মুহূর্তে যাচাই করবার সময় এলো কি? কিসের জন্যে ছুটে মরা মরীচিকার পেছনে।

ঠাকুরমার চেহারাটা মনে পড়ছে। ঠাকুরমা চোখে দেখতে পায় না। বৃদ্ধা লাঠি ঠুকে ঠুকে এগিয়ে চলেছে। ছেলের বউকে জিজ্ঞাসা করছে নাতির কথা। অরুণাংশুর কথা। অরুণাংশুর ডাক নাম নাড়ু। ভালো আছে তো নাড়ু। অনেকদিন নাড়ুর খোঁজ নেই। বাড়ির লোকেরা বুঝিয়েছে চাকরি নিয়ে চলে গেছে নাড়ু বহু দূরে। তা চাকরি নিলেও মাঝে মাঝে বাড়ি আসতে হয় বৈকি। আশী বছরের বুড়িটাকে কি একবার দেখতে ইচ্ছে করে না। এ কেমন ধারা চাকরি। এ চাকরিতে কি ছুটি নেই। নাড়ুর মাঝে মাঝে শরীরটা খারাপ হতে পারে। কে দেখে তাকে তখন। নাড়ুর ইচ্ছে না হোক ঠাকুরমার তো একবার নাড়ুকে আদর করতে ইচ্ছে করে। অরুণাংশুর মা চোখে আঁচল চাপা দেয়। ঠাকুরমা বিড়বিড় করে অনেক কিছু বলে যায়। অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করে। নাড়ুর মা কতো আর উত্তর দেবে।

—হ্যাঁ মা। নাড়ুর চাকরিতে কতোটা উন্নতি হলো? এখন সে কতো টাকা মাইনে পায়? মাঝে মাঝে সে টাকা পয়সা পাঠায় তো? আমাকে না দিক কিছু। তোমাকে দেয় তো। এ ধরনের অনেক কিছু প্রশ্ন। পুত্রবধূ মানে অরুণাংশুর মা শাশুড়ীকে এ বয়সে কষ্ট দিতে চায় না। বানিয়ে বানিয়ে সব কিছু বলে যায়। ছেলে অরুণাংশু ভালো চাকরি করছে বিদেশে। সে মাসে মাসে সময় মতো টাকা পাঠায়। সে টাকা থেকেই বৃদ্ধার জন্যে অনেক কিছু কেনা কাটা হয়। বৃদ্ধার বিছানার চাদরটা যে নাড়ুরই টাকায় কেনা। ঠাকুরমার শরীর বেঁকে গেছে। কুঁজো মানুষটা লাঠি ভর করে অতি কষ্টে দাঁড়িয়ে আছে। মন দিয়ে শুনছে পুত্রবধূর কথা। আনন্দে তার চোখটা বুজে আছে। নাড়ু বলতে ঠাকুরমা অজ্ঞান। নাড়ু নিরুদ্দেশ হয়েছে জানলে ঠাকুরমা একটি দিনও বাঁচবে না। তাই বানিয়ে বানিয়ে পুত্রবধূকে সব কিছু বলতে হয়। বৃদ্ধা চোখে কিছুই

দেখতে পায় না। চোখ দুটো সুস্থ অবস্থায় থাকলে দেখতে পেতো অরুণাংশুর মার দু'চোখে অশ্রুবন্যা। অরুণাংশুর মনে চিন্তা।
অরুণাংশু ভাবছে এই মুহূর্তে তার মা কি করছে। হয়তো সন্ধ্যা-প্রদীপ দেখাচ্ছে। প্রণিপাত করছে ঠাকুরের কাছে। ছেলের মঙ্গল কামনা করছে। বোনটার বিয়ের বয়েস হয়েছে। ভরপুর যৌবন। দাদার ফেরবার জন্যে সে অপেক্ষা করছে। দাদা ঘরে ফিরে এলে সে বিয়েতে সম্মতি দেবে। এই মুহূর্তে নবনীতাকে মনে পড়ছে। নবনীতা বড্ডো ভালবাসতো অরুণাংশুকে। পার্টির কাজ নিয়ে অরুণাংশু এতো ব্যস্ত থাকতো যে নবনীতার দিকে ফিরে তাকাবার সময়টুকু পর্যন্ত পাওয়া দুষ্কর ছিল। ঢলঢলে মুখখানা নবনীতার, নম্র আচরণ। লাজুক লাজুক স্বভাবের মেয়েটা। অরুণাংশু যদি কোনোমতে বেঁচে যেতো তাহলে একবার যেতো নবনীতার সঙ্গে দেখা করতে। ভালবেসেছিলো সে নবনীতাকে।
সুমিত্রা অন্ধকারে দৌড়ুচ্ছে। সুমিত্রার মস্তিষ্কের ভেতর নরখাদকের নাচ চলেছে। গুলীর সঙ্গে সঙ্গে অরুণাংশু উঠে এসে সুমিত্রার গলার কাছটা খামচে ধরেছিলো। অরুণাংশু তখন টলছিলো। ওর হাত দুটো ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সুমিত্রা ততোক্ষণে পালাবার চেষ্টায় ব্যস্ত। অরুণাংশুর দুর্বল হাত দুটো ওর ব্লাউজটা চেপে ধরেছিলো। ফ্যাস করে ছিঁড়ে গেল ব্লাউজটা। অরুণাংশু সুমিত্রার পিঠটা দুহাতে চেপে ধরবার চেষ্টা করেছিলো। অরুণাংশুর কয়েকটা নখ সুমিত্রার পিঠে বিদ্ধ হয়েছে। বেশ যন্ত্রণা হচ্ছে সুমিত্রার। দৌড়ুতে দৌড়ুতে মনে হচ্ছে চারদিকে বড্ডো হাওয়ার অভাব। নিশ্বাস টানতে কষ্ট হচ্ছে তার। হাঁফ ধরছে ঘন ঘন। কতোক্ষণ দৌড়ুতে হবে কে জানে। সামনে বার বার একটা প্রাচীর পথ রুখে দাঁড়াচ্ছে। শুধু ক্লান্তি আর শ্রান্তি। মার মুখ বারবার মনে পড়ছে। মা তাকে জোর করে বেলুড় আর দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যেতো। ওখানে যেতে প্রবল আপত্তি ছিলো সুমিত্রার। ওখানে গেলে মানুষের মনটা ভীষণ দুর্বল হয়ে যায়। আজ এই মুহূর্তে কেন জানি বারবার মনে পড়ছে রামকৃষ্ণের সেই ফটোটার কথা। তখনই

মনে হতো কেমন যেন তার দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। আচ্ছা অরুণাংশু যদি না মরে। একটা গুলী তার লেগেছে ঠিকই। আর সুমিত্রা নিশ্চিত যে আর একটা গুলী লক্ষ্যচ্যুত হয়েছে। গুলী করবার সময় দু'বারই হাতটা ভীষণ কেঁপেছিলো। ধৌলি প্রান্তর আবার রক্তা-রক্তি হলো। অরুণাংশু হয়তো বেঁচে নেই। অরুণাংশুর প্রেতটা যেন সুমিত্রাকে তাড়া করে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে। রাত্রির স্তব্ধ নিস্তব্ধতা। ধানের শীষের টানে পা ক্ষত বিক্ষত।

কলকাতায় সাদার্ন-মার্কেটের সামনে চীনেবাদাম বিক্রী করতো ছেলে-টার মুখ মনে ভেসে ওঠে। তখন স্কুলের ওপরের ক্লাশে পড়তো সুমিত্রা। ছেলেটার কাছ থেকে দিনের পর দিন কতোই না চীনেবাদাম কিনে খেয়েছে সুমিত্রা। ছেলেটার দিকে তাকালে কেমন যেন মায়া হতো সুমিত্রার। চীনেবাদাম বিক্রী করবার সময় ছেলেটা তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে অনেকটা বেশীই দিতো সুমিত্রাকে। একরাশ চীনেবাদাম তার শাড়ীর আঁচলে ঢেলে দিয়ে অদ্ভুত একটা দৃষ্টি নিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতো। মুগ্ধ দৃষ্টি ছাড়া আর তাকে কি বলা যায়। সেখানে কি দেখতো কে জানে। ছেলেটা দরিদ্র চীনেবাদামওয়ালা হলে কি হয় ওর মুখে চোখে চলাফেরা চাল চলনে অভিজাত বংশের ছাপটা বড্ডো সুস্পষ্ট ছিলো।

কি হয়েছিলো সুমিত্রার কে জানে। প্রতিদিন বিকেল বেলা নির্দিষ্ট সময়ে সুমিত্রা ছুটে যেতো সেই ছেলেটির কাছে। চীনেবাদাম কিনলে মনটা যেন ভরতো না। চীনেবাদাম খাওয়ার চেয়ে কেনার দিকে ঝোঁকটা থাকতো বেশী। আর ছেলেটাও প্রতিদিন চীনেবাদাম নিয়ে তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতো। একদিন কে বা কারা ছেলেটাকে পেছন থেকে ছুরি মারলে। কোমরে ঝোলানো ঝুলি থেকে নিয়ে নিলে সমস্ত টাকাকড়ি। হয়তো দীর্ঘ দিন পরিশ্রম করে ছেলেটি অনেক পয়সা জমিয়েছিলো। হয়তো লোভ। হয়তো শত্রুতা। কে জানে। মৃত-দেহটা বেশ কয়েক ঘণ্টা সড়কের ওপর পড়ে ছিলো।

দু থানার মধ্যে অনেকক্ষণ তর্ক বিতর্ক বচসা হয়েছিল ওর দেহ সরানোর ব্যাপার নিয়ে। কার এলাকায় ওই মৃতদেহ পড়েছে তাই নিয়ে কলরোল। বাদানুবাদ। মৃতদেহের মুখে কোনো বিকৃত ভাব ছিল না। সহজ সরলতা মাখানো মুখখানা। ঠোঁটের কোণে একটু বিদ্রূপের হাসি। ও যেন বলতে চাইছিল, দ্যাখো কতো সহজে এ বিশ্রী জঘন্য নোংরা দুনিয়াটা থেকে মুক্তি পেয়ে গেলাম।

সবাইকার সঙ্গে সুমিত্রা লাশ দেখতে গিয়েছিলো। কেন গিয়েছিলো কারণ সে আজও জানে না। আরো আশ্চর্যের কথা সে তাদের বাড়ির ছাদের চিলে কোঠায় অনেকক্ষণ ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলো। কেন কেঁদেছিল? চীনেবাদাম বিক্রী করতো একটা ছেলে। তার জন্যে কান্না। আজকে ভাবলেও হাসি পায়।

তবে পুলিশের রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছিলো ছেলেটি নাকি ভালো বংশের ছেলে ছিল। রিফিউজীর খাতায় নাম লিখিয়েছিলো। ছেলেটা এসেছিলো পূর্ব বাংলা থেকে।

বাবার চেহারাটা মনে পড়ছে। ধীর, স্থির, শান্ত। ভেতরের চেহারাটা কাউকে সহজে টের পেতে দেয় না। প্রথম প্রথম পার্টির মিটিং সেরে বাড়ি ফিরতে রাত হতো। বাবার হাতের চড়-চাপড় খেতে হয়েছে বৈকি।

তবুও বাবার ওপর রাগ হতো না। না খেয়ে সে শুয়ে পড়তো। মধ্য-রাতে টের পেতো বিছানার কাছে বাবা খাবারের থালা হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাবাকে ফিরিয়ে দেবার শক্তি তার ছিল না।

সুমিত্রা যখন বাড়ি ছেড়ে উধাও হয়েছিলো তখন বাবা বলেছিল— ও মেয়ে খারাপ পথে যাবার নয়। তবে বাড়ি ছেড়ে যখন একবার চলে গেছে তখন এ বাড়িতে সে যেন আর ফিরে না আসে। হারিয়ে যখন গেছে তখন চিরদিনের মতো হারিয়েই যাক।

বাবা পুলিশে খবর দেয়নি। কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়নি। আত্মীয়স্বজনের কাছে মেয়ে সম্বন্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করেনি। যে গেছে সে যাক।

একটা কি সামনের দিক থেকে এগিয়ে আসছে। নেকড়ে নাকি?

রিভলবার বাগিয়ে ধরে সুমিত্রা। জন্তুটা সরে গেল। অন্ধকারে দিক নির্ণয় করা অসম্ভব। এই মুহূর্তে আলিপুর জেলের সেই ভীষণ মোটা জাঁদরেল চেহারা পাহারাওয়ালা দুটোকে মনে পড়ছে। মনে পড়ছে ওদের পুষ্ট গোঁফ জোড়া। ভারী বুট জুতো পরে রাতের অন্ধকারে যখন ওরা টহল দিয়ে বেড়াতো। জেলের গরাদের ওপাশে বসে সুমিত্রা শুনতো আর ভাবতো।

হঠাৎ একটা পাথরের চাঁই-এর সঙ্গে জোর ধাক্কা খেয়ে সুমিত্রা একটা গর্তের মধ্যে উল্টে পড়ে।

উফ্। একটা যন্ত্রণাসূচক ধ্বনি তার মুখ থেকে বেরিয়ে যায়। সুমিত্রা জ্ঞান হারায়।

ওদিকে আর একটি দেহ অভিমান নিয়ে পড়ে থাকে। অসহায়। মধুর যন্ত্রণা কি? অশ্রু, রক্ত, ঘাম। প্রেম আততায়ীর গুলীতে ছিন্ন ভিন্ন। মাঠে ঘাস আর ফুল। এদিকে চাপ চাপ রক্ত। সঙ্গে একরাশ বিস্ময়। অন্ধকারটা থরথর করে কাঁপছে। সপ্তর্ষির চিহ্ন নেই। ফুলগুলো ফুটে ফুটে মরে যাচ্ছে। তারাগুলো জ্বলে জ্বলে ক্ষয়ে যাচ্ছে।

নক্ষত্রগুলো লজ্জায় নিষ্প্রভ কি?

প্রেম, ভালবাসা, বিশ্বাস, প্রীতি স্নেহ সব ধৌলি প্রান্তরে ধুয়ে মুছে সাফ। রুধিরে আপ্লুত হয়ে পড়ে থাকে একটি দেহ। শুধু দলাদলি। শুধু হিংসা, দ্বেষ, ছলনা, ক্রূরতা। নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা। মানুষের কাছে মানুষের রেহাই নেই। অফিসে কেরাণী কাজ করবে। কারখানায় মজুর পরিশ্রম করবে। মাঠে কৃষক লাঙ্গল চষবে।

পরিবারে শিশু কাঁদবে। হাসবে। বধূ ভালবাসবে। আর এদিকে পরাজয়ের কালিমা সারা অঙ্গে লেপন করে পড়ে থাকবে একটা দেহ। ক্ষত বিক্ষত। পরাজিত লাঞ্ছিত। অসহায়, পরিত্যক্ত। অবহেলিত।

## ৩

এ আমার গল্প নয়। অর্জুন বহিধরের গল্প। উড়িষ্যার দেওগড়ের প্রাসাদোপম অট্টালিকার ভেতর বসে গল্প বলে যাচ্ছিলো অর্জুন বহিধর। আমি ছিলাম আগ্রহী শ্রোতা। বহিধরের মুখ থেকে ঠিক যেমনটি শুনেছিলাম ঠিক তেমনিভাবে বিবৃত করে যাচ্ছি।

দুই অশ্বারোহী চলেছে। অশ্বক্ষুরের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে ঘন ঘন। আকাশে কালো কালো মেঘের রাশি। মেঘের পেছনে চাঁদটা আত্ম-গোপন করেছে। মাঝে মাঝেই বালুর ঘূর্ণি। অশ্বারোহী দু'জনের ভেতর একজন আমি। আর একজন আনন্দ বেহেরা। নিস্তব্ধ নিথর প্রান্তর। জনমানবের সাড়া নেই। এখানে বেতার নেই। বিমান নেই।

মনে হচ্ছে মহাকাল নির্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে আছে। অশ্বপৃষ্ঠে আমরা দু'জন যেন মানুষ নই। কোনো অশরীরী। বর্তমান কাল থেকে ফিরে গেছি বহুকাল আগে।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটছে নাকি? কোণারক সৃষ্টিকর্তা নরসিংহদেব আর তার মন্ত্রী কি এগিয়ে চলেছেন? তাদের আগমনের উদ্দেশ্য কি মন্দির পরিদর্শন? আমরাও কি মন্দির পরিদর্শনে চলেছি? সামনেই বিরাট ভগ্ন কোণারক মন্দির। আমরা চলেছি সঙ্গোপনে। রেখেছি নিজেদের আগমন বার্তা অঘোষিত। এখান থেকেই কি পরম পরাক্রম-শালী নরসিংহদেবের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিলো। শত্রু নিধনে মেতে উঠেছিলো নরসিংহদেবের বিজয় বাহিনী। উড়িষ্যার সীমারেখা অতিক্রম করে শত্রু সৈন্য দলিত মথিত করে নরসিংহদেবের বিজয় বাহিনী নিজ আবাসভূমিতে ফিরে এসেছিলো।

একবার নয়।

বেশ কয়েকবার! বিজয় সাফল্যে গর্বিত বোধ করেছিলেন নৃপতি

আর তার ফলপ্রসূ-এ কোণারক মন্দির। কতো অর্থ, কতো মেহনত। তবেই না সমাপ্ত হয়েছিলো এ কোণারক মন্দির।
বারশো শিল্পী বছরের পর বছর নিজেদের শিল্প কৌশল উজাড় করে ঢেলেছে মন্দিরের সমাপ্তির জন্যে। তাদের চেষ্টা, পরিশ্রম, অধ্যবসায়, দক্ষতার জ্বলন্ত নিদর্শন ওই কোণারক মন্দির। বারো বছরের সমস্ত রাজস্ব নৃপতি নরসিংহদেব ঢেলেছেন কোণারক মন্দির গড়ে তোলবার কাজে। কোণারকের প্রাচীর গাত্রে, পাথরে, শিলায় উৎকীর্ণ রয়েছে নৃত্যগীত, ভোগ সম্ভোগ, যুদ্ধ উন্মাদনার পরিপূর্ণ এক ছবি। কোণারকের ইতিহাস মহান ঐতিহ্যপূর্ণ।
আমি ভাবছিলাম এ গভীর অন্ধকার রাতে জনশূন্য প্রান্তরে কান পাতলে কি শোনা যাবে অশ্বের হ্রেষাধ্বনি? হস্তির বৃংহণ কিংবা রথের ঘর্ঘরধ্বনি? শোনা যাবে কি পদাতিক সৈন্যের জয়োদীপ্ত পদক্ষেপ? বন্দীদের চরণের শৃঙ্খলের ঝনঝনানি?
আজ নৃপতি নেই। গজ নেই। অশ্ব নেই। নেই রণকুশলী সেনানীর বিজয় উল্লাস। নেই বন্দীদের দীর্ঘনিশ্বাস। সব গেছে। রয়েছে কোণারক। সমস্ত স্মৃতি বুকে ধরে কোণারক দাঁড়িয়ে রয়েছে, নির্বাক। সব শান্ত। ভগ্ন পাষাণ স্তূপ নিজ গৌরবে মহান মহিমান্বিত।
শুধু মাঘ মাসের এক পুণ্য দিনে এখানে অসংখ্য তীর্থযাত্রীর ভীড়ে স্থানটি একদিনের জন্যে সরগরম হয়ে ওঠে। ঐ দিনই কৃষ্ণের ছেলে শম্বা সূর্য দেবের কৃপায় কুষ্ঠ ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ করেছিলেন। এ অঞ্চলের পাশ দিয়ে এক সময় প্রবাহিত চন্দ্রভাগার জলে তিনি সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে পূজো দিয়েছিলেন।
আজকের কোণারক ঐ মাটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোণারকের পাথর টুকরো টুকরো হয়ে মাটিতে খসে পড়েছে।
আর চন্দ্রভাগা একটু একটু করে নিজেকে গুটিয়েছে। বালুরাশি ধীরে ধীরে চন্দ্রভাগাকে শুষে নিয়েছে। কোথায় অদৃশ্য হলো সেই বিরাট পোতাশ্রয়? একদিন ঐ চন্দ্রভাগার জলে ভাসতো বিরাট বিরাট সব

তরণী। তাদের কি অপূর্ব নির্মাণ কৌশল। কাষ্ঠের সঙ্গে স্বর্ণ, রজত ও তাম্রের অপূর্ব মিশ্রণ। কোনোটি শ্বেত। কোনোটি পীত বা রক্তাভ। মুক্তার লহরের দ্বারা ভূষিত। নৌকোর সম্মুখে সিংহ, মহিষ, সর্প, হস্তী, ব্যাঘ্র, মনুষ্য প্রভৃতির মুখাকৃতি বিন্যাসেরও ব্যবস্থা ছিল।

এক সময় অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করে কোণারকের ভগ্নস্তূপের দিকে এগিয়ে গিয়েছি। কোণারকের প্রবেশ পথে রয়েছে অশ্বমূর্তি।

পায়ে পায়ে আমরা দু'জন এগিয়ে চলেছি। ভগ্ন অলিন্দ, খিলান, প্রাচীর, দালান, সিঁড়ি সব কিছু এক এক করে পার হয়েছি। অন্ধকার গভীর থেকে গভীরতর। পৌঁছে গেছি নাট মন্দিরে। নাট মন্দিরের দেয়ালে সারি সারি মশাল জ্বলছে। সেখানেই লক্ষ্য করলাম মানবী আপন মনে নেচে চলেছে। অপূর্ব সে নাচ। মশালের আলো স্থানটিকে সম্পূর্ণ আলোকিত করতে পারে নি। আলো আর অন্ধকার মিলে মিশে স্থানটিকে আরো রহস্যময় করে তুলেছে, মনে হলো এক সম্পূর্ণ অপরিচিত জগত। সুগন্ধি নির্যাসে আমোদিত আবহাওয়া। বীনার ঝঙ্কারের সঙ্গে অপূর্ব সুরমূর্ছনা। মৃদঙ্গ সৃষ্টি করছে অপূর্ব শব্দ লহরীর। নানা অলঙ্কারের সমন্বয়ে রাগ রাগিনীকে প্রাণবন্ত করে তোলবার নিখুঁত প্রচেষ্টা। এক অপূর্ব মায়াময় মোহময় পরিবেশ। ভূত নেই। ভবিষ্যত নেই। বর্তমান বিস্মিত। স্মৃতি নিস্তেজ। অবসাদগ্রস্ত। এক অপূর্ব রূপসী নারী। সম্ভবত দেবদাসী হবে। নৃত্যরতা অবস্থায় চটুল পদক্ষেপে আমাদের সামনে এগিয়ে এসেছিলো। পানপাত্র তুলে ধরেছিলো আমার ওষ্ঠের কাছে। আমি পানপাত্র থেকে চুমুকে চুমুকে তরল পানীয় গলাধঃকরণ করেছি। সমস্ত দেহে আমার এক অদ্ভুত উন্মাদনা। ধমনীতে রক্ত প্রবাহ দ্রুততর হয়েছে। মস্তিষ্কে লেগেছে সুরার ঝাঁঝ। ভুলে গেছি আমি চারশো টাকা মাইনের সামান্য এক সাপ্লাই অফিসার। সে রাতে আমি যেন এক রাজকুমার। সঙ্গীসহ পৌঁছে গেছি সেই বহু পুরোনো যুগের এক দেবদাসীর গৃহে। দেবদাসী নৃত্যরতা অবস্থায় মাথা নিচু করে আমাকে অভিবাদন করেছিলো। তার দক্ষিণ হস্তের অনামিকায়

আমি অঙ্গুরী পরিয়ে দিয়েছিলাম। এরকম নির্দেশই আমার ওপর ছিলো। পানপাত্র নিঃশেষ করে ওর দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম। দেবদাসী তরল পানীয় দিয়ে পানপাত্র বারবার পূর্ণ করে দিয়েছিলো। আমার ওপর আদেশ হয়েছিলো—রাজকুমার তুমি দেবদাসীকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করো।

—না। না। তা সম্ভব নয়। ফিস ফিস করে বলেছিলাম।

—না। দেবদাসীকে তোমার আজ আলিঙ্গনে আবদ্ধ করতেই হবে। রাজকুমারের বাহুবন্ধনে ধরা দেবার জন্যে সে আজ প্রস্তুত। রাজকুমারকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে এ নৃত্যগীতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজ রাত পরস্পর পরস্পরের কাছে ধরা দেবার জন্যে। সঙ্গী বলে।

আমি হস্ত প্রসারিত করবার সঙ্গে সঙ্গে দেবদাসী আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। চুম্বনে চুম্বনে আমাকে অস্থির চঞ্চল করে তুলেছিলো। আমার মনে সঙ্কোচ, ভয়, দ্বিধা। আমি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিলো আমি যেন ওর বহুদিনের পরিচিত। ওই নারীর সে কি গভীর আকুলি বিকুলি। পারিপার্শ্বিক ভুলে নারী আমার বুকে মুখ-ঘষছিলো। বন্ধনমুক্ত হবার জন্যে আমার চেষ্টার কসুর ছিল না। এক সময় কন্যা আমাকে ছেড়ে দিয়ে খানিকটা দূরে সরে গিয়ে অপলক দৃষ্টি ফেলে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। পলকহীন সে দৃষ্টি। ওর যেন পাথরের চোখ। দেহ যেন পাথরে গড়া। আমার কণ্ঠনালী দিয়ে ততোক্ষণে আরো অনেকটা তরল পদার্থ গড়িয়ে নেমে গেছে। বর্তমান, ভূত, ভবিষ্যত সমস্ত আমার ধ্যান ধারণার বাইরে। আমি যেন অনেক অনেক অশরীরী অস্তিত্ব টের পাচ্ছি। কোণারক মন্দিরে আমরা কয়েকজন আর নই। অনেক অনেক দেহহীন কায়াহীন অশরীরীর আবির্ভাব ঘটেছে। কালজয়ী কোণারক আজ রাতে প্রাণ পেয়ে জেগে উঠেছে। আমি তন্ময় হয়ে শুনে যাচ্ছিলাম অর্জুন বহিধরের কাহিনী।

বহিধর বলে চলেছিলো। ত্রয়োদশ শতাব্দীর অসংখ্য শিল্পীর শিল্প সাধনার আশা আকাঙ্ক্ষার কোণারক এক জ্বলন্ত নিদর্শন। ওই মন্দির নৃপতি

নরসিংহ দেবের এক অনবদ্য দান।
দেবদাসী আবার নৃত্যে মেতে উঠেছে। সঙ্গে যন্ত্র সঙ্গীতের অপূর্ব সুর-মূর্ছনা। দেবদাসী রূপসী। লজ্জাবতী। ওর লম্বা একহারা গড়ন। এক সময় সম্ভবত গৈরিক বর্ণ ছিল। কিন্তু রঙটা জ্বলে গেছে। সুললিত নৃত্য ছন্দে এগিয়ে এসে সে আমার কণ্ঠে মালা পরিয়ে দিয়েছিলো। একবার নয়। দু'বার নয়। বেশ কয়েকবার। তন্বীদেহ নৃত্যের অপূর্ব সুষমা-মণ্ডিত হিল্লোল তুলে লীলায়িত গতিতে এগিয়ে এসে আমার কণ্ঠলগ্না হয়ে আমার কণ্ঠে মালা পরিয়ে দিয়েছিলো।
নৃত্যগীতে সমৃদ্ধ সে রাত। চুমুকে চুমুকে আমি তরল পানীয় পান করে ছিলাম। দেবদাসী ক্ষণে ক্ষণে সুরা পান করছিলো। আর যারা উপস্থিত ছিল তারাও সুরাপানে ছিল ব্যস্ত। মৃদঙ্গ, বীনা সুরের মূর্ছনা তুল-ছিলো। শিল্পীরা যেন সব পাথরের মূর্তি। শিল্পসাধনায় মগ্ন। মনে হয়েছিল আমরা যেন কেউ এ শতাব্দীর মানুষ নই। মনে হচ্ছিলো ফিরে গেছি নরসিংহ দেবের আমলে।
পাখীর কাকলি যা বাইরের জগতের সঙ্গে এতোক্ষণ সেতুবন্ধ সৃষ্টি করে ছিল তা থেমে গেছে। মনের দর্পণে নিজের চেহারাটা আর চিনতে পারছিনে। মাথায় উষ্ণীষ। গলায় মুক্তোর হার। রাজবেশ পরিধান করে উপস্থিত হয়েছি এখানে। উপস্থিত হয়েছি গভীর রাতে এক ভগ্ন দেব দেউলে। মনে হচ্ছে আকাশের সীমা নেই। সপ্তর্ষির আলো নেই। নারী অবাধে বুকের বন্ধন মুক্ত করে দিয়েছে। ওর চোখে ফুটে উঠেছে কামনার বহ্নি। নৃত্যের ফাঁকে ফাঁকে বারবার ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমার বুকে। দংশনে দংশনে অস্থির করে তুলেছে আমাকে। প্রথমে দংশন জ্বালা অনুভব করেছি। পরে আর কিছু অনুভব করি নি। আমার মাংস মজ্জা ত্বকে কোনো অনুভূতি ছিল না।
ক্ষুধা নেই। তৃষ্ণা নেই। মৃদঙ্গ আর বীনা বাদকের দেহে কোনো স্পন্দন নেই। শিল্পীরা নৃত্যরতা কন্যার মতোই নিজ সাধনায় তন্ময়। ধ্যানজ্ঞান রহিত।

মনে পড়ে নৃসিংহ দেবের বারশো শিল্পী কারিগরদের। সন্ধ্যার প্রাক্কালে সবাই ক্লান্ত শ্রান্ত। মন্দিরের আশেপাশে এদিক সেদিক সবাই বিশ্রাম লাভ করছে। বেশীর ভাগই ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু জেগে আছে শিল্পী-দের প্রধান। তার চোখে ঘুম নেই। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে মন্দিরের নির্মাণ কৌশল দেখছে। যাচাই করছে।

শিল্পী ডুবে আছে শিল্পসাধনার ভেতর।

নৃপতি নৃসিংহ দেব এসেছেন মন্দির পরিদর্শন করতে। কাজ কতদূর এগুলো সে বিষয়ে নিজেই খোঁজ খবর নিতে এসেছেন। অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করে নিঃশব্দ চরণে মন্দির চাতালে উঠে এসেছেন। এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি প্রধান কারিগরের পেছনে। শিল্পী ধ্যানমগ্ন। চিন্তায় অস্থির।

শুধু মাঝে মাঝে পেছনে হাত বাড়িয়ে ধরছে।

অনুচর সে শূন্য হাত পানের খিলিতে ভরে দিচ্ছে। নৃপতি বহু পূর্বেই ইঙ্গিতে অনুচরকে স্থান পরিত্যাগ করবার আদেশ জানিয়েছিলেন। এবার কারিগর শ্রেষ্ঠ পানের খিলির জন্যে পেছনে হাত বাড়াতেই নর-সিংহ দেব নিজে তার হাতে পান তুলে দিলেন। সে পান মুখে পুরে শিল্পী চমকে উঠলো। এ পানের স্বাদ গন্ধ যে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। এ সৌরভ যে তার পরিচিত। মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়ালো সে। সর্বনাশ।

নৃপতি নরসিংহ দেব তার পশ্চাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানালো সে। আজ রাতে আমি নৃসিংহ দেবের মতোই মৃদঙ্গ এবং বীণা বাদকের পেছনে পান পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে-ছিলাম।

শিল্পীদ্বয় হাত বাড়িয়ে ধরতেই আমি পানপাত্র হাতে তুলে দিয়েছিলাম। কয়েক চুমুকে পানপাত্র খালি করে শিল্পীদ্বয় শূন্য পানপাত্র আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। একটি কথাও বলে নি।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শিল্পীরা কান পাতলে শুনতে পেত চন্দ্রভাগা নদীর কুলুকুলু ধ্বনি। আমি কান পেতে আজ সে ধ্বনি যেন খানিকটা

শুনতে পাচ্ছিলাম। খুবই অস্পষ্ট। সেদিন চন্দ্রভাগা নদী ছিল পূর্ণ যুবতী। অস্থির চঞ্চল, সেদিন চন্দ্রভাগার কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল বিরাট বন্দর। পালতোলা বিরাট বিরাট সওদাগরী নৌকো বিভিন্ন সওদা নিয়ে পাড়ি দিত দূর দূর দেশে। সমুদ্রের বুকে ভেসে বেড়াতো প্রকাণ্ড ময়ূরপঙ্ক্ষী নৌকোগুলো। অক্লেশে চলে যেতো জাভা, সুমাত্রা বালি দ্বীপে। নয় তো সিংহল, নয় তো আফ্রিকার কোনো বন্দরে মাল নামিয়ে দিতো। পণ্যসামগ্রীর ভেতর থাকতো মশল্লা, সুতৌ, রেশম, বস্ত্র, মণিমুক্তো, বিচিত্র সব পাথর। বন্দর-বন্দরের ভেতর চলতো পণ্য সামগ্রীর আদান প্রদান। আমদানী আর রপ্তানী।

কোণারক মন্দির গাত্রে খোদিত রয়েছে এক মূল্যবান চিত্র। নৃপতি সিংহাসনে আসীন। তাকে বিদেশী সওদাগরের দল উপঢৌকন দিচ্ছে। উপঢৌকনের ভেতর রয়েছে একটি জিরাফ। বিচিত্র প্রাণী। ভারতে যার সন্ধান মিলতো না। উপঢৌকন সম্ভবত এসেছিলো আফ্রিকার কোনো এক দেশ থেকে। কোণারকের দেয়াল গাত্রে নৃত্যরতা অপ্সরী। কিন্নরী মানবী। ললনার দল। নৃত্যলাস্যে চটুল। অপূর্ব সুষমা মণ্ডিত। বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীরত সুন্দরীরা।

মনে মনে বলি—"কথা কও হে অনাদি অনন্ত।" যেদিকে তাকাও নারী। নারী আর নারী। সর্বত্রই নারীকে সুষমা মণ্ডিত করে তোলবার এক আপ্রাণ প্রয়াস। সৌধ প্রাকারে, পাথর প্রাচীরে স্বপ্ন সার্থক করে তোলার আকুল আগ্রহ। কোথাও রয়েছে যুদ্ধের উন্মাদনা। স্ত্রীরা নিজ নিজ মহিমায় মহিমান্বিত। আর রয়েছে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা। এই তিনের সমন্বয়ে মন্দির মহান। ঐতিহ্য পূর্ণ। যুদ্ধ, নৃত্য, গীত। মিলন বিরহের সব অপূর্ব চিত্র। দক্ষ স্থপতি আর শিল্পীর দল গড়েছে আর গড়েছে। পাথরের বুকে তিল তিল করে সৌন্দর্য সাজিয়ে এক অপূর্ব জগতের সৃষ্টি করেছে। নারীকে সাজিয়েছে প্রেম আর প্রীতির ফুলসজ্জায়। ঢেলেছে শ্রদ্ধা। দিয়েছে সৌন্দর্য। করেছে শ্রীমণ্ডিত। দেবতার আরাধনায় মগ্ন নারী। নৃত্যরতা নারী।

প্রিয়তমের সান্নিধ্যলাভে উন্মুখ নারী। মিলনের আবেগে আবেশে ভরপুর নারী। প্রাণ সৃষ্টির মাধুর্যে যেন এক প্রাণবন্ত নারী। সৃষ্টির খেলায় পাগলিনী নারী। বিরহ বেদনায় কাতর নারী। সঙ্গীত, নৃত্য, হাসি, লাস্যে মেতে ওঠা নারী। যৌবনের পূজারিনীরা দু'হাত উজাড় করে ঢেলেছে।

আজ রাতে মনে হয় কেউ সুস্থির নয়। কেউ অচঞ্চল নয়। পাথর কথা বলছে। প্রতিটি মূর্তি প্রাণ পেয়েছে।

প্রসাধনরতা সুন্দরী নারী আমার দিকে তাকিয়ে হানছে বিলোল কটাক্ষ। প্রেমিকের সঙ্গে মিলোন্মুখ নারী সভয়েই তঃস্তত দৃষ্টিপাত করছে। কোথাও বা মাতৃত্বের জন্যে উন্মুখ নারী। সৃষ্টির আনন্দে বিভোর। ভোগেই বুঝি চরম তৃপ্তি। আজ রাতে কান পাতলে অনেক কিছু বুঝি শোনা যাবে। আজ সব কিছু সজীব। কান পাতলে শোনা যায় অশ্বক্ষুরধ্বনি। রথ চক্রের ঘর্ঘরধ্বনি। যক্ষিনীরা পরস্পরের মধ্যে আলাপনরতা। তাদের হাসি ঝর্ণাধারার মতো পাথরের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে নূপুর নিক্কন। কাঁকনের শব্দ। বীণার ঝঙ্কার। নৃত্যগীতে পটিয়সী নারীরা নৃত্যগীতে মেতে উঠেছে। কোণারকের দেয়াল গাত্রে এরা এক একটি মূর্তি নয়। এক একটি কবিতা। প্রত্যেকে তার নিজস্ব গল্প বুকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মানবী, কিন্নরী, অপ্সরা যক্ষিণীর দল। বারশো শিল্পীর সার্থক শিল্প সৃষ্টি।

মন্দির গাত্রে এক নারী প্রাণ পেয়ে সজীব হয়ে উঠেছে। খিলখিল করে হেসে ওঠে নারী। সে বলে—'ওগো তুমি এসেছো? তোমারই অপেক্ষায় রয়েছি যে আমি।'

—আমার অপেক্ষায়!—তা নয়তো কি। তোমারই অপেক্ষায় রয়েছি। তোমাকে যে আমি দীর্ঘদিন ধরে কামনা করে আসছি। আজো সে কামনার নিবৃত্তি হয় নি। এ কথা বলে নারী তার ওষ্ঠ বাড়িয়ে ধরে।

—তিল তিল করে সৌন্দর্য আহরণ করে আমার সৃষ্টি।

রূপসী নারী অজস্র ছলকলায় রপ্ত। হাসিতে মুখর।—তুমি কে?

প্রশ্ন করি আমি।—আমি। আমি ছিলাম নগরের শ্রেষ্ঠ নর্তকী। চারু-প্রভা আমার নাম। তোমাকে যখন আমি শেষবার দেখেছিলাম তখন তুমি দাঁড়িয়েছিলে পালতোলা ময়ূরপঙ্ক্ষী নৌকোর ওপর।—আমি দাঁড়িয়েছিলাম ময়ূরপঙ্ক্ষী নৌকোয়? চমকিত বিস্মিত আমি।—হ্যাঁ তুমি। তোমার ছিল গৌরবর্ণ। পিঙ্গল কেশ। দীর্ঘদেহ। ক্ষীণ কটি। সারা অঙ্গে ছিল আভিজাত্যের আভাস।

—না। না। আমি। আমি সে নই। তুমি ভুল করছো সুন্দরী। আমি প্রতিবাদের ঝড় তুলি। —না। আমার ভুল হয় নি। আমার পক্ষে ভুল করা সম্ভব নয়। আমি যে সাগ্রহে তোমার অপেক্ষায় রয়েছি। তুমি নতুন রূপে আমার সামনে উপস্থিত হয়েছো। ওগো তুমি আমাকে প্রবঞ্চনা করার চেষ্টা ক'রনা। কি জবাব দেবো ভেবে পাইনে। বলি—ঠিক আছে। মেনে নিচ্ছি আমি আর সে ব্যক্তি অভিন্ন। তোমার কাহিনী তুমি বলে যাও—তুমি ছিলে পরবাসী। ভিনদেশ থেকে এসেছিলে তুমি। কোন্ নগরী থেকে তোমার আগমন হয়েছিল তা আমার জানা ছিল না। সারারাত ধরে নর্তকীর রূপসুধা পান করেছিলে তুমি। সারারাত ধরে প্রেমখেলায় মেতেছিলে তুমি। অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার বুক শূন্য করে তুমি চলে গেলে। বিদায় নিলে আমার কাছ থেকে।—কোথায় যেতে হল আমাকে?—চলে গেলে তোমার তরণীতে। সমুদ্র বক্ষে পোতাশ্রয়ের ভেতর শুভ্র পাল তুলে তোমার তরণী এক শ্বেত রাজহংসের মতো গ্রীবা তুলে ভাসছিল। তোমার তরণীতে ছিল কত দ্রব্য সম্ভার। দূর দেশ থেকে তরণী বহন করে এনে-ছিল ও সমস্ত দ্রব্যসম্ভার। নৃপতির পায়ে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিলে সব কিছু। কত উপঢৌকন কে তার হিসেব রাখে। কত মণি মুক্তো হীরে জহরত। তরণীর ভেতর সাজিয়ে ছিলে মশল্লার পাহাড়।

—কি করে তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হল?

—সমুদ্রের নীলজলে আমি সাঁতার কাটছিলাম। সমুদ্র সৈকতে দাঁড়িয়ে তুমি বোধ করি আমার সন্তরণ ক্রীড়া দেখে মুগ্ধ হয়েছিলে। আরো

মুগ্ধ হয়েছিলে বোধ করি আমার রূপ যৌবন দেখে। তোমার ওষ্ঠে ছিল মৃদু মধুর হাসি রেখা।

—তুমি কি করছিলে ?

— আমি তোমার দিব্য কান্তি দেখে সমস্ত কিছু ভুলেছিলাম।

—দিব্যকান্তি পুরুষ তোমাকে শুধু ভোগই করলে। সঙ্গে নিতে চাইলো না।

— না গো না। পুরুষের স্বভাব ভোগের পর জীর্ণ পাতার মতো ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া। তোমার তরণীতে একটুখানি ঠাঁই পাবার জন্যে কতো অনুরোধ। কতো উপরোধ। তোমার মন কিন্তু কিছুতেই ভিজলো না।

—তরণীতে ঠাঁই হল না তোমার ?

—আমি ছিলাম নর্তকী। পাঁচজন আমার দেহ ভোগ করেছে। কেন তুমি ঠাঁই দেবে তোমার তরণীতে। তুমি ফেলে এসেছো তোমার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা। তাদেরকে ভোলা তোমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কতো চেষ্টা করলাম তোমার মন গলাবার জন্যে। সব ব্যর্থ হল।

—তোমার কি মনে হয় নি যে আমার পক্ষে স্ত্রী পুত্র কন্যাকে ভুলে থাকা অন্যায় হত।

— ভোগের আগে তোমার সংসারের কথা মনে হয় নি। মনে হয়েছিল ভোগের পর। পাপ পুণ্যের হিসেব আগে হয় নি। হয়েছে পরে। তাই অতি সহজে তুমি আমাকে প্রত্যাখান করলে। সমুদ্রপোত দুলতে দুলতে এগিয়ে চললো। আমি কূলে দাড়িয়ে রইলাম। আঁখিজলে আমার গণ্ডদেশ প্লাবিত হল। একটি সমুদ্রপোত নয়। বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন আকারের সমুদ্রপোত। সারিবদ্ধ ভাবে তারা সব এগিয়ে চলেছে।

— তোমার দেখছি সব কথা মনে রয়েছে।

—কেন থাকবে না। সমস্ত স্মৃতি বুকে ধরে যে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি। সমুদ্রে ভাসমান তরণীর নাম পর্যন্ত আমার মনে গাঁথা রয়েছে।

—নামগুলো বলে যাও। আমি শুনবো।

—মধ্যমা, ভীমা, চপলা, পত্রপুটা, গর্ভরা। আর সবাইকে পাহারা দিয়ে

নিয়ে চলেছে চতুরি।

যুদ্ধ করবার জন্যে সব সময় প্রস্তুত চতুরি।

—যুবা পুরুষ কি করছিল তখন ?

—সমুদ্রপোতের পাটাতনের উপর তুমি তখন দাঁড়িয়েছিলে। তোমার ঊর্ধ্বাঙ্গ ছিল অনাবৃত। দেহের উপরিভাগে আলগোছে ফেলা ছিল তোমার উত্তরীয়। তোমার শিরে ছিল উষ্ণীষ। শুভ্রদেহ। পৌরুষব্যঞ্জক চেহারা। আমি মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে তোমার দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

—যুবাপুরুষ হয়ত ছিল কলিঙ্গর শৈলেন্দ্র নৃপতিদের বংশধর, যারা অষ্টম শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত জাভা, সুমাত্রা দ্বীপে রাজত্ব করেছিল। আমি ইতিহাস থেকে খানিকটা আওড়ে যাই।—তোমাকে আমি দেখছিলাম আর ভাবছিলাম। আমার সমস্ত আকুলি বিকুলি ব্যর্থ হল।

নিলে না তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে। ময়ূরপঙ্ক্ষী নাও ভাসতে ভাসতে এক সময় দৃষ্টির বাইরে অদৃশ্য হল। আমি কেঁদে ভাসালাম।

—তারপর কি হল প্রভা ?

—চারুপ্রভা পাগলিনী প্রায়। এক সময় চারুপ্রভা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল চন্দ্রভাগার জলে। সলিল সমাধি হল আমার। বেঁচে থেকে লাভটা কি হত আমার। তোমাকে আমি ভুলতে পারতাম না কখনো। বৃদ্ধ স্বামী বুঝি আমার অভাবে পাগলই হয়ে গিয়েছিল।

—তোমার স্বামী ছিল একথা বলনি তো।

—আমার বৃদ্ধ স্বামী আমাকে খুবই ভালবাসতো। আমাদের ভেতর অনেকগুলো বছরের ব্যবধান ছিল। ছেলেপুলে ছিল না আমাদের। স্বামী আমাকে কিছুতেই ভুলতে পারলো না। কোণারক নির্মাণকারী কারিগরদের ভেতর সে ছিল একজন। শোকে মুহ্যমান কারিগর আমাকে কোণারকের দেয়াল গাত্রে খোদাই করে অমর করে রাখলো।

আমি মরে গিয়েও বেঁচে রইলাম। কোণারক মন্দিরগাত্রে বন্দিনী হলাম।

—চারুপ্রভা মনে হচ্ছে তুমি অন্যায় করেছিলে। মনে মনে নিশ্চয়ই তুমি অনুতপ্ত।

—কখনোই নয়। বৃদ্ধ স্বামী আমাকে কি দিতেপারতো। দিতেপেরেছিল একটি পুত্র সন্তান। না পারে নি। দারিদ্রের কশাঘাত সহ্য করা আমারপক্ষে সম্ভব ছিল না। অনাহার অর্ধাহার দিনের পর দিন আমি সহ্য করেছি। তাইতো হয়েছিলাম নর্তকী। তাই আমার পরিচয় ছিলো বারবণিতা বলে।—ছি !

--তুমি আমাকে ঘৃণা করতে পারো। কিন্তু তোমাকে পেলে আমি সমস্ত কিছু ত্যাগ করতে রাজী ছিলাম। তোমার চরণে আমি সারা অন্তর অর্পণ করেছিলাম। তোমাকে না পেয়ে আমি নিজেকে চন্দ্রভাগার জলে উৎসর্গ করেছিলাম। ওগো কানপেতে কি শুনতে পাচ্ছো চন্দ্রভাগার কুলুকুলু ধ্বনি? ও জলে বড্ডো শান্তি। বড্ডো আরাম। চারুপ্রভা নীরব হতেই প্রাচীর গাত্রে আর এক নারী সজীবসচলহয়ে ওঠে। সে খিল খিল করে হেসে ওঠে। নারী দু'হাত তুলেবলে—এসো এসো আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ো। কি সাহস নেই। তোমরা পুরুষজাত এতো দুর্বল, এতো অসহায়। অথচ আকাঙ্ক্ষার সীমাজ্ঞান নেই। আমি যখন জীবিত ছিলাম তখন আমার সর্বনাশ করতে একটুকুও ভাবলে না।—আমি তোমার সর্বনাশ করেছিলাম। আমার বিস্ময়ের অন্ত থাকে না।—না। না। তুমি নও। তোমার মতো আর একটি পুরুষ। নরকের কীট, কি দোষ করেছিল আমার স্বামী। কি দোষ করেছিলাম আমি।

আমি বিস্মৃত। বিমূঢ়। কি করবো ভেবে পাই নে।

—তুমি বুঝি তোমার জীবনের গল্প শোনাতে চাইছো।

—হ্যাঁ।

—কি নাম তোমার ?

—চারুকেশী। জানো আমি সুন্দরী শ্রেষ্ঠা ছিলাম। ভালবাসতাম আমি আমার স্বামীকে। কোণারকের শিল্পী কারিগরদের ভেতর আমার

স্বামীও ছিল একজন। কোণারক নির্মাণকারী শিল্পী মহলে আমার স্বামীর নাম দিন দিন সুনাম ছড়াচ্ছিলো। আরতারচেয়েবেশী সুনাম ছড়িয়েছিল চারুকেশীর। একে আমি ছিলাম অসম্ভবসুন্দরী। তদুপরি নৃত্য গীতে পারদর্শিনী। ওগো আর সুরাপান করো না। সুন্দরী হাত বাড়িয়ে আমাকে মদ্যপান থেকে বিরত করতে চেষ্টা করে।

—আজ রাতে মদ্যপানে বাধা দিও না সুন্দরী। তোমার গল্প বলো।

—আমার স্বামী ছিল সুপুরুষ। সুদর্শন। আমার প্রেমে অন্ধ। কিন্তু তার ওই একটি বদদোষ ছিল। সারারাত মদে ডুবে থাকতো। কতো বারণ করেছি। শুনতো না আমারকথা। আমার কাহিনী শুনতে ভালো লাগছে তোমার।

- ভালো লাগছে। বলে যাও।

--রাজ ঔরষে কিন্তু দাসী গর্ভে ওই নরকের কীটের জন্ম হয়েছিল।

—কার কথা বলছো?

—যে আমার সর্বস্ব হরণ করতে চেষ্টা করেছিল সেই নরপশু নর-পিশাচের কথা বলছি। রাজ ঔরষে জন্মাবার সৌভাগ্য লাভ করে পশুটা রাজপ্রাসাদে লালিত পালিত হয়েছিল। ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো ঘুরতো আমাদের কুটিরের আশে পাশে। কখন আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে তারই চেষ্টা। আমার স্বামী কোণারক গঠন কার্যে মশগুল। আত্মহারা। দু'চোখ ভরে তার গড়বার স্বপ্ন।

—স্বামীকে তোমার দুর্গতির কথা জানিয়ে ছিলে?

—হ্যাঁ। জানিয়েছিলাম। আর তাতেই বিষময় ফল ফললো। স্বামীর দুর্গতির সীমা পরিসীমা রইলো না।

—কি হল তোমার স্বামীর?

—এক সন্ধ্যায় এই কচি কোমল দেহটার ওপরপশুটাঝাঁপিয়ে পড়ল। স্বামী এর জন্যেই অপেক্ষা করছিল। লুক্কায়িত স্থান থেকে বের হয়ে সে পশুটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে রক্তাক্ত করে ছাড়লো।—উপযুক্ত কাজই করেছিল।

—কিন্তু কি লাভ হল তাতে।

—কেন ?

—পশুটা রাজপ্রাসাদে ফিরে গিয়ে তার দুর্গতির কথা জানালে। তাকে অপদস্ত করার কথা সদর্পে বললে। এও জানালে যে অযথা তাকে নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছে। আমার কুৎসা রটনা করলে। আমার বিরুদ্ধ সমালোচনায় সমস্ত প্রাসাদ মুখরিত হল। পশুটা জানালে যে আমার স্বামীর শিল্পকলার বিরুদ্ধ সমালোচনা করবার জন্যেই তার ওই দুর্গতি। সমস্ত রাজরোষ পড়লো আমার স্বামীর ওপর। বিচারের সময় সাজানো সাক্ষীর তলব পড়লো। মিথ্যে সাক্ষ্য দিলো তারা। প্রমাণ করলো তারা যে আমি অসতী। প্রমাণ করলো আমার স্বামী কর্তব্যকর্মে অবহেলা করেছে। তার শিল্প কর্মে অনেক খুঁত রয়েছে। নির্দিষ্ট দিনে সে কর্তব্য-কর্মে অবহেলা করে অযথা সময় নষ্ট করছিল। রাজকোষের মুদ্রা অপ-চয়ের জন্যে সে দায়ী। এরকম অনেক কিছু মিথ্যে অপবাদ দিয়ে আমার স্বামীকে দোষী সাব্যস্ত করলে।

—বিচারে কি স্থির হল।

—আমার স্বামী দোষী বলে অভিযুক্ত হল। আর রাজ আজ্ঞায় তার দু'হাতের দুটো করে চারটে আঙুল কেটে ফেলা হল।

—এত বড় শাস্তি !

—এত বড় শাস্তি হয়তো হত না। কিন্তু পতি দেবতা প্রকাশ্য রাজ-দরবারে সতীত্বের প্রতি কটাক্ষপাত সহ্য করতে না পেরে অসৌজন্যতা প্রকাশ করে ফেলেছিল। প্রকাশ্য সভায় নৃপতিকে অবমাননা করার অপরাধে গুরুতর শাস্তির আদেশ হল। কোণারকের নির্মাণ কার্যে অংশ গ্রহণ করতে অসমর্থ হল আমার স্বামী। বারশো শিল্পীর ভেতর সে একজন হতে পারলো না।

—সত্যি খুব দুঃখের কথা।

—আমার স্বামীর মনে কোনো ক্ষোভ ছিল না। কোনো দুঃখ ছিল না। কিন্তু আমি এ আঘাত সহ্য করতে পারলাম না। ঝাঁপিয়ে পড়লাম

চন্দ্রভাগার জলে। চন্দ্রভাগার জলে আমি ডুবে মরলাম।

—মন্দির গাত্রে কে গড়লো তোমাকে?

—আমার স্বামীর বন্ধু বাঁচিয়ে রাখলো আমাকে পাথরের বুকে খোদাই করে। জানো দিনের পর দিন আমার স্বামী পাষাণ প্রতিমার দেহে মাথা রেখে অশ্রু বিসর্জন করতো। অশ্রু ধারায় সিক্ত হতো আমার দেহ। আমি বারে বারে কেঁপে কেঁপে উঠতাম। নাও আমাকে ভোগ করো। দ্বিধা কেন। লজ্জা কেন? উন্মাদিনীর মতো হাসতে থাকে চারুকেশী।

এদিকে নাট মন্দিরে দেবদাসী নেচে চলে। মাংসমজ্জা রক্ত নিয়ে সে পূর্ণ মানবী। পাষাণ প্রতিমা নয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নৃপতি নরসিংহ দেবের প্রচেষ্টায় বারশো শিল্পীর দিবারাত্রির অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ গড়ে উঠেছিলো এ কোণারক। আজ রাতে কি প্রতিটি মূর্তি আমাকে শোনাবে তাদের জীবন কাহিনী। প্রত্যেকে তার নিজস্ব গল্প বলবে। কতো ইতিহাস। কতো রোমাঞ্চ। কতো প্রেম। কতো অশ্রুজল। সমুদ্র সৈকতে পড়ে আছে ভগ্ন কোণারক। আপন বিরাটত্বে মহিমান্বিত। আমাকে নিয়ে এসেছে এক স্বপ্ন পুরীতে। শুধু বিস্ময় আর বিস্ময়। আজ রাতে মূর্তিরা সজীব আর চঞ্চল। শুধু প্রাণের প্রাচুর্য। কান পাতলে শোনা যায় অশ্বের হ্রেষাধ্বনি। হস্তি বৃংহন। রণদামামা বেজে চলেছে। পদাতিক সৈন্যরা শুরু করেছে পদযাত্রা। রথের ঘর্ঘর ধ্বনি। বন্দীদের চরণের শৃঙ্খল ঝনঝনানি। আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সারি দিয়ে বন্দীরা চলেছে। মস্তকে তাদের বিরাট বিরাট পাথরের চাঁই। আমি শুনতে পাচ্ছি দেবদাসীদের নূপুর নিক্কণ। বীণার সুর ঝঙ্কার। সুগন্ধ নির্যাসের গন্ধে বাতাস মাতোয়ারা। আমার কানের কাছে আর এক সুন্দরী ফিসফিস করে কথা কয়ে ওঠে।

—লক্ষ্মীটি শোনো আমার কাহিনী।

—কে তুমি?

—আমি এলোকেশী।

—কি তোমার বক্তব্য ?

—জানো ঐ চন্দ্রভাগার জলে আমার প্রেমিক ডুবে মরেছে।

—দেখতে পাচ্ছি চন্দ্রভাগা অনেককেই গিলে খেয়েছে। কিন্তু তোমার প্রেমিক ডুবে মরলো কেন ?

—বাধ্য হয়ে ছিলো।

—বাধ্য হয়েছিল ?

—হ্যাঁ তাই।

—কে তোমার প্রেমিক ?

—বারশো শিল্পীর যিনি ছিলেন প্রধান তারই পুত্র।

—তোমার গল্প বলো আমি শুনবো।

—কারিগর প্রধান মন্দিরের কাজ সম্পন্ন করবার জন্যে স্ত্রী পুত্র ছেড়ে চলে এসেছিলো। পুত্রকে যখন ছেড়ে এসেছিলো তখন পুত্র খুবই ছোট। বহু বছর কেটে গেছে পিতার ঘরে ফেরবার সময় হয় নি। এ দিকে পুত্র কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করে একদিন চলে এসেছে পিতার সন্ধানে। চলে এসেছে কোণারক নির্মাণ স্থলে। পিতা শিল্পীদের প্রধান তখন তার সাধনায় নিমগ্ন। পুত্র পিতাকে খুঁজে বের করলো। আত্ম পবিচয় নিবেদন করলো। পিতা পুত্রে মিলন হল।

—কিন্তু তুমি ওদের সঙ্গে নিজেকে কি করে জড়ালে ?

—আমার পুত্রের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়া মাত্র পরিচয় নিবিড় থেকে নিবিড়তম হল। প্রথম দর্শনে পরস্পর পরস্পরের প্রেমে পড়লাম।

—বলো শুনি তোমাদের প্রেম উপাখ্যান।

—চন্দ্রভাগার জলে অবগাহন করতে এসে আমি চন্দ্রভাগার জলে সাঁতার কাটছিলাম। আমি ছিলাম সন্তরণ পটু। কিন্তু তবু কোথায় যেন কি হল। পড়লাম এক প্রবল ঘূর্ণি স্রোতের ভেতর। ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছিলাম। আমার আর্ত চিৎকারে ছুটে এলো একটি যুবক। ঝাঁপিয়ে পড়লো চন্দ্রভাগার জলে মুহূর্তকাল চিন্তা না করে।

—বুঝেছি। ব্যক্তিটি বোধ করি প্রধান শিল্পীর পুত্র।

-- ঠিক তাই। জ্ঞান হলে দেখলাম দিব্য কান্তি এক পুরুষ। অপূর্ব সুষমা-মণ্ডিত যার মুখ মণ্ডল। বীরত্বব্যঞ্জক চেহারা। দু'জন দু'জনকে প্রচণ্ড ভালবেসে ছিলাম।

—তোমাদের প্রেম কি পরিপূর্ণতা পেয়েছিলো ?

-- জানাচ্ছি তোমাকে সে কাহিনী। কোণারকের আরদ্ধ কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে পারে নি কোণারকের শিল্পীরা। নৃপতি চিন্তা-গ্রস্ত। বিমর্ষ। উত্তেজিত। রাগান্বিত। রাজকোষের সমস্ত অর্থ ঢেলেছেন মন্দির নির্মাণ কার্যে। মাসের পর মাস। বছরের পর বছর। কাজ এগুচ্ছে না মোটেও, কোথায় কি যেন জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে।

শিল্পীকুল দিশেহারা। পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

—নৃপতি কি করলেন ?

—নৃপতি আদেশ জারি করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত না হলে প্রতিটি শিল্পীর শিরচ্ছেদ কার্য শুরু হবে। প্রথমেই যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হবে শিল্পী প্রধানকে।

—তা তোমার প্রেমিকের সঙ্গে এ সবের কি সম্বন্ধ।

—শিল্পী প্রধান যখন শঙ্কিত, চিন্তিত, বিমর্ষ, বাকী শিল্পীদের চোখে যখন নিদ্রা নেই এমনি সময়ে এগিয়ে এলো সেই যুবক। শিল্পী প্রধানের পুত্র। পিতাকে সাহায্য করতে পুত্র এগিয়ে এলো।

—সে কি ভাবে পিতাকে সাহায্য করলে ?—কি তার জ্ঞান ? কি তার দক্ষতা ?

—যুবকের ধমনীতে বইছিলো পিতৃ পুরুষের রক্ত। আর পিতৃ-পুরুষদের সবাই ছিল দক্ষ কারিগর। দক্ষতা নেমে এসেছিলো বংশ পরম্পরায়। আর বংশ পরম্পরায় সমস্ত গুণের অধিকারী হয়েছিলো ওই যুবক। ওদের সবাইকার চেয়ে বোধ করি সে ছিল আরো বেশী দক্ষ।

অতি অনায়াসে নির্মাণ-কার্য সম্বন্ধীয় সমস্ত জটিল প্রশ্নের সমাধান সে খুঁজে বের করলো। তার আপ্রাণ চেষ্টায় এগিয়ে চললো কোণারক

গড়ার কাজ।

—তারপর ?

—দক্ষ শিল্পী ওই প্রধান কারিগরের পুত্র। তরুণ পুরুষ আহার নিদ্রা ভুলে গিয়েছিলো। আমাকে ভুলে গিয়েছিলো। কতো সন্ধ্যায় আমি বৃথাই তার আগমন অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। কর্মব্যস্ত যুবকের আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ-এর সময় মেলে নি। কি করে সে আমার সঙ্গে দেখা করবে। তখন যে সে কোণারক নির্মাণে ব্যস্ত। পিতাকে-সাহায্য করবার জন্যে দিবারাত্র পরিশ্রম করে যাচ্ছে। আমি অপেক্ষা করে কেঁদে কেঁদে ভাসিয়েছি। বিরহ যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়েছি। অপমানে জর্জরিত হয়েছি। অন্তরভরা অভিমান নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছি।

—সে কি আর আসে নি ?

—হ্যাঁ এসেছিলো। কোনো কোনো রাতে আচমকা এসে আমাদের গৃহে উপস্থিত হয়েছে। কর্মক্লান্ত দেহ শয্যার ওপর এলিয়ে দিয়েছে। সে আমাকে আদর করতে করতে বলেছে—তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। গভীর দায়িত্ব আমার ওপর অর্পিত হয়েছে। পিতার চিন্তাভার লাঘব করবার দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত হয়েছে। পিতার সম্মান বজায় রাখবার ভার আমার ওপরে। সুন্দরী এর পর কিছুক্ষণ থেমে থাকে। ফেলে দীর্ঘশ্বাস। তারপর এক সময় আবার শুরু করে।—জানো আমার সুখ দীর্ঘদিন স্থায়ী হল না।

—কেন ?

—রাজরোষ থেকে অব্যাহতি পেলো শিল্পীরা। কিন্তু ততোদিনে তাদের অন্তরের কোণে কোণে জমেছে ঈর্ষার কালো ছায়া। তরুণের এ প্রতি-পত্তি, এ যশ, এ দক্ষতা তারা কি করে সহ্য করবে। এ যে তাদের বিরাট পরাজয়। শেষ পর্যন্ত কোণারক নির্মাণ কৌশলের গুপ্ত বিদ্যা এক তরুণের কাছ থেকে শিখতে হলো তাদের। শিল্পীদের আত্মসম্মানে প্রচণ্ড ঘা লাগলো। কোণারকের নির্মাণ কার্য ততোদিনে নতুন পথে মোড় নিয়েছে। দ্রুতগতিতে কাজ এগিয়ে চলেছে। কিন্তু শিল্পীগোষ্ঠী

ভাবছে আর ভাবছে। তাদের লজ্জার সীমা পরিসীমা নেই।
নৃপতির কাণে এ খবর পৌঁছুলে তাদের অসম্মানের চূড়ান্ত হবে।
—এক নিরপরাধ তরুণের ওপর বয়স্কদের এতো হিংসে। বলি আমি।
—নৃপতির কর্ণগোচর হলে কোথায় দাঁড়াবে তারা। নৃপতি বলবে—অপদার্থের দল। বৃথাই বছরের পর বছর এদের পেছনে রাজকোষের সমস্ত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। নৃপতির কাছে প্রমাণিত হবে তাদের অযোগ্যতা।
—কি করলে তারা?
—শিল্পীরা একজোট হয়ে মন্ত্রণায় বসলো। তারা দলপতিকে মানে শিল্পী প্রধানকে জানালে পুত্রকে নিয়ে রাতারাতি দেশত্যাগী হবার জন্যে।
—দলপতি নিশ্চয়ই ভেঙ্গে পড়েছে ততোদিনে। একদিকে গড়ার কাজ। অন্যদিকে পুত্র। দুশ্চিন্তার নিশ্চয়ই সীমা পরিসীমা ছিল না।—তা নয় তো কি। কোণারক শিল্পীদের এ আদেশের অর্থ হল দলপতি আর শিল্পীদের প্রধান থাকবে না। কোণারক গড়বার কাজ চলবে কিন্তু শিল্পী প্রধান ওদের সঙ্গে থাকবে না। এতোদিনের পরিশ্রম, ক্লান্তি, সমস্ত বিফল হবে। কোণারক গড়বার শিল্পীদের নামের তালিকায় শিল্পী প্রধানের নাম থাকবে না। দুঃখকষ্টে ভেঙ্গে পড়ে শিল্পী কুলের চূড়ামণি। পান আহার ত্যাগ করে সে। রাতের নিদ্রায় ঘন ঘন ব্যাঘাত ঘটতে থাকে।
—পুত্রের কি অবস্থা?
—পিতার দুঃখকষ্ট পুত্র সহ্য করতে পারে না। সে রাত দিন ভেবে চলে কি করে সে পিতার দুঃখ লাঘব করবে। পিতা থাকবে না কোণারক গড়ার কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এ তার চিন্তার বাইরে। পিতার সঙ্গে সঙ্গে ছেলের জীবনেও দুঃখের কালো ছায়া নেমে আসে। আমাদের দু'জনের ভেতর দেখাশুনা বন্ধ হয়।
—তারপর কি হল?

—পিতা কিন্তু পুত্রকে নিয়ে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলো। পুত্রের চেয়ে কোণারক বড় নয়। কিন্তু পুত্র রাজী হয় নি। সে কিন্তু অন্য পথ বেছে নিয়েছিল। আর পথ বেছে নিয়ে মনস্থির করে ফেলেছিলো। তার পথের কথা পিতাকে বলে নি। আমাকে বলে নি।

—কি সে পথ? আমি প্রশ্ন করি।

—আত্মাহুতি দিলেই তো সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়। পিতার শিল্পী জীবনের গৌরব সম্মান ফল খ্যাতি সব অক্ষুণ্ণ থাকে। পিতা এবং বাদ বাকী শিল্পীদের ভেতর সে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে নিয়েই যতো হিংসা দ্বেষ। বাদানুবাদের সৃষ্টি তাকে নিয়েই।

—তারপর কি হল?

—জানো যে রাতে সে চন্দ্রভাগার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ বিসর্জন দিলে সে রাতে তার কি স্ফূর্তি। আমাকে মুহূর্তের জন্যেও বুঝতে দেয় নি তার অভিপ্রায়। নৃত্যগীতে ভরপুর সে রাত। যৌবনের জয়গানে মেতে উঠেছিলো সে। জীবনকে সে রাতে পুরোপুরি উপভোগ করবার পর আমার কাছে বিদায় নিয়ে সে চলে গেল। আর ওই যে গেল আর ফিরলো না সে। আত্মাহুতি দিলে চন্দ্রভাগার জলে। পরদিন প্রভাতে চন্দ্রভাগার জলে ভেসে উঠলো যুবকের প্রাণহীন দেহ।

—তোমার কি হল এলোকেশী?

—আমি বিষ পান করে জীবনের সমস্ত জ্বালা জুড়োলাম। যুবকের পিতা শিল্পী প্রধান আমাকে মন্দির গাত্রে অমর অক্ষয় করে রেখেছে। আরো অনেক নারীমূর্তি তাদের কাহিনী শোনাবার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ততক্ষণে দেবদাসীর নৃত্যের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। দেবদাসী বর্তিকা হাতে এগিয়ে চলেছে। অঙ্গুলী নির্দ্দেশে তাকে অনুসরণ করতে বলেছে। আমি তার আদেশ অনুসারে তার পশ্চাতে নিঃশব্দ গতিতে এগিয়ে চলেছি। সুন্দরী ততোক্ষণে মন্দির চাতাল থেকে সিঁড়ি অতিক্রম করে নীচে নেমে পা পা করে বালুকারাশির ওপর দিয়ে পথ করে এগিয়ে চলেছে। আমার মনে ভয় শঙ্কা। আমি ওকে কেন

অনুসরণ করছি তা আমি নিজেও জানিনে। আমার সঙ্গী আমাকে আহ্বান করেছে ওকে অনুসরণ করতে। মন্দির চাতালে যন্ত্রীরা যন্ত্র নিয়ে পাথরের মতো বসে রয়েছে। তাদের মুখে একটি শব্দও উচ্চারিত হয় নি। যন্ত্র নীরব। দেবদাসী চলেছে বর্তিকা হাতে। আমি তাকে অনুসরণ করছি। কেন চলেছি জানিনে। কোথায় চলেছি জানতে পারি নি। দেবদাসী আমার সম্মুখে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। আর আমি বালুভূমির ওপর দিয়ে কয়েক হাতের দূরত্ব বজায় রেখে তাকে অনুসরণ করছি। আকাশে গুম গুম শব্দ। আকশটা গর্জাচ্ছে। সারা আকাশ জুড়ে কালো কালো মেঘ। চাঁদের ক্ষীণ আভাস। আমাদের আশেপাশে শুধু বালু। এই বালুভূমি একদিন তৃষ্ণার্ত হয়ে চন্দ্রভাগাকে শুষে খেয়েছে। এখন চন্দ্রভাগা নেই। অনেকটা দূরে জলাশয়ের ক্ষীণ একটা রেখা। অনেক ধরনের পাখী বালুর ওপর বসে ঝিমুচ্ছিলো। মনুষ্য পদ-শব্দে ডানা ঝাড়া দিয়ে পালাতে শুরু করেছে। বক, পানকৌড়ি, নাইট হেরন। পাখীদের অবিরাম কিচির মিচির। ক্রমশঃ যেন ভিজে মাটির স্পর্শ পাচ্ছি। বালুতে শামুক আর শামুকের খোল। কাঁকড়া দাড়াখাড়া করে দৌড়ুচ্ছে। গোটা দুই গোসাপ চোখে পড়লো। পেছনে অনেকটা দূরে কোণারক মন্দিরটা একটা প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মতো পড়ে আছে। মনে মনে ভাবি যে জাতির দুর্মদ সামরিক প্রতাপ ও অহমিকার পদ-ভরে সারাটা অঞ্চল কেঁপে কেঁপে উঠতো তারা আজ কোথায়? মনে মনে ভাবছি এ কালরাত কখন ফুরোবে? ভোরের গোধূলি রং কখন ফুটবে? বর্তিকা হাতে রূপোপসারিণী এ আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছে? বিদ্যুতের ঘনঘন চমকে আকাশ শিহরিত। খর বায়ুর চুম্বনে অস্থির। মেঘের গুরু গুরু ধ্বনি। এইতো খানিকক্ষণ আগে মন্দিরের ভেতর নূপুরের নিক্কন ধ্বনি শোনা গিয়েছিলো। মেঘমল্লারের সুর ধ্বনিত হয়েছিলো বীণাতে। পাথরের বুকে নর্তকীরা সজীব হয়ে উঠেছিলো।

কন্যা নীচু হয়ে বর্তিকা নামিয়ে রেখে খানিকটা দূর এগিয়ে গেল। তারপর হাত বাড়িয়ে বালুরাশি খুঁড়তে শুরু করলো। দুহাতে বালুরাশি

সরাতে আরম্ভ করলো। আমি স্তব্ধ হয়ে সবকিছু দেখছি। কন্যার খানিকটা পশ্চাতে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি। দেবদাসী কতোক্ষণ আর বালু সরিয়েছিলো। কয়েক মিনিট সম্ভবত। কিন্তু তারপরই গগনভেদী এক চিৎকার। গেলুম গেলুম। বাঁচাও বাঁচাও। উফ্ কি জ্বালা। বুঝতে পারলাম না কোথায় কি ঘটে গেল। কন্যা বিষে জর্জ্জরিত হয়ে ততোক্ষণে বালুর ওপর লুটিয়ে পড়েছে। দ্রুত পদক্ষেপে তার কাছে এগিয়ে গেলাম। ততোক্ষণে আমার সঙ্গীও এসে গেছে। যন্ত্রণায় গড়াচ্ছে কন্যা। সমস্ত দেহটা তার বিষে নীল হয়ে গেছে। গর্তের ভেতর থেকে বের হয়ে ভীষণ বিষধর সাপটা ছোবল দিয়েছে। গভীর রাতে কোণারক মন্দিরে সর্পাঘাতে দেবদাসীর মৃত্যু হল। আমার মনে একটা প্রশ্ন বার বার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিলো। কন্যা কেন রাতের বেলা বালুর ওপর দিয়ে হেঁটে এগিয়ে গিয়েছিলো? কি ছিল তার উদ্দেশ্য? কেনই বা সে বালুর ভেতর গর্তে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছিলো? কেন? কেন?

আমার সঙ্গী আনন্দ বেহেরাকে একটার পর একটা প্রশ্ন করেছি। আনন্দ বেহেরা বলেছিল সমস্ত কিছু। শুনিয়েছিলো পুরো ইতিহাস। ওই বালুর ভেতর কোনো এক সময় বিরাট একটা ডায়মণ্ড লুকোনো ছিল। দেবদাসী ছাড়া ডায়মণ্ডের কথা কারু জানা ছিল না। সে রাতে ডায়মণ্ডের সন্ধানে বর্তিকা হাতে দেবদাসী এগিয়ে চলেছিলো। দেবদাসীর মৃত্যুর পর আমি আর আনন্দ বেহেরা স্থানটা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি। মেলেনি কিছুই সে রাতে। কোণারক মন্দিরে দেববাসীর মৃতদেহ সামনে রেখে আনন্দ বেহেরার কাছে সমস্ত ঘটনাটা পুরোপুরি শুনেছিলাম। ওর কাছে যা শুনেছিলাম তারই পুনরাবৃত্তি করছি।

বেশ কয়েক বছর আগে এক রাতে কোণারক মন্দিরে এক যুবাপুরুষ এক দেবদাসীকে নিয়ে স্ফূর্তি করতে এসেছিলো। সঙ্গে ছিল আনন্দ বেহেরা আর জনা তিনেক যন্ত্রী, যারা সঙ্গীতে সহাযাগিতা করবে। দেবদাসীকে পুণ্যবতী নামে সবাই জানতো। নাচগান মদ্যপান চলেছিলো অনেক রাত পর্যন্ত। যন্ত্রীরা সে রাতেও বাদ্য যন্ত্র নিয়ে সুর সাধনায় মেতে

উঠেছিল। সে রাতের নর্তকী ছিল এই পুণ্যবতী, আজ রাতে যার নশ্বর দেহ পড়ে আছে মন্দির চাতালে। সেই যুবাপুরুষ ছিলো পুরোনো এক নেটিভ স্টেটের যুবরাজ। নাচগানের আগে, স্ফূর্তি আহ্লাদ শুরু হবার আগে যুবরাজ সন্তর্পণে বের করেছিল একটি বিরাট ডায়মণ্ড। দেখিয়েছিল নর্তকী-কে। প্রতিজ্ঞা করেছিল নাচের পর ওই ডায়মণ্ডটি তাকে উপহার দেবে। একবার ডায়মণ্ডটি যুবরাজ পকেট থেকে বের করে আলোর সামনে ধরেছিল। ডায়মণ্ডের দ্যুতিতে নর্তকীর সঙ্গে দ্বাররক্ষী এবং বেহেরার চোখগুলোতে লোভ চক্‌চক্‌ করে উঠেছিল। অন্তরের লোভটা প্রকাশ পেয়েছিল স্পষ্টভাবে। যুবরাজের ভালো লাগে নি সে দৃষ্টি। তার অন্তরে একটা অবিশ্বাস মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ওদের ফিস্‌ফিসানি, ওদের ক্রূর বক্রদৃষ্টি যুবরাজকে চঞ্চল করেছে। অস্থির করেছে। সে বুঝেছিল লোভী নারীপুরুষ সময় আর সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে। সুযোগ পেলে ডায়মণ্ডটা তারা আত্মসাৎ করবে। তখন দরকার হলে তার টুঁটি টিপে ধরতেও পেছপা হবে না। অভিশপ্ত এ ডায়মণ্ড অনেকের জীবনে আজ বিপদ ডেকে এনেছে। এ ডায়মণ্ডটার জন্যে একজন আর একজনকে অনায়াসে খুন করেছে। কেউ ডায়মণ্ড হস্তগত হবার পর আত্মহত্যা করেছে। কেউবা উন্মাদ হয়েছে। সমস্ত যেনে শুনেই যুব-রাজ ডায়মণ্ডটা কিনেছিল। সে লোভ সামলাতে পারে নি। ডায়মণ্ডটা কেনার পরেই যুবরাজের স্ত্রী কোনো অজ্ঞাত কারণে আত্মহত্যা করেছে। সমস্ত জেনেও যুবরাজ ডায়মণ্ডের লোভ সংবরণ করতে পারে নি। কি এক প্রবল আকর্ষণ। আজ এখানে পৌঁছুবার আগে বিকেলের দিকে তার কাছে টেলিগ্রাফে সংবাদ পৌঁছেছিল যে তার একমাত্র পুত্র কি একটা অজানা অজ্ঞাত রোগে আক্রান্ত হয়েছে। ডাক্তার রোগের কারণ নির্ণয় করতে অসমর্থ হয়েছিল। এ দুঃসংবাদ পাবার পরও সে কোণা-রক মন্দিরে আসার লোভ সামলাতে পারে নি। কোণারক মন্দিরে সারারাত সে দেবদাসীর সঙ্গে স্ফূর্তি করবে। সারারাত নাচগান চলবে। চলবে মদ্যপান। সঙ্গে রয়েছে সেই ডায়মণ্ডটা।

অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে পুরোপুরি বেসামাল হবার আগে ডায়মণ্ড-টার জন্যে একটা অসাধরণ দুর্বলতা তাকে পেয়ে বসলো। সে বুঝে-ছিলো নরপশুগুলো এ সুযোগ হেলায় হারাবে না। তাই দেবদাসীর সঙ্গে সলা পরামর্শ করে সে বালুভূমির দিকে পা-পা করে এগিয়ে গিয়েছিলো। বালুর ভেতর ডায়মণ্ডটা পুঁতে রেখে কোণারক মন্দিরে ফিরে এসেছিলো। নাচগানে মেতে উঠেছিলো। কিন্তু কেন জানি যুব-রাজের মনটা বার বার উতলা হল। সে বিশ্বাস হারালো দেবদাসীর ওপর। কি জানি অন্যান্যদের সঙ্গে চক্রান্তে যদি দেবদাসীও যোগ দেয়। তাছাড়া ততোক্ষণে সে স্থির করে ফেলেছে যে ওই ডায়মণ্ডটা দেব-দাসীকে কখনোই উপহার দেওয়া চলবে না। ডায়মণ্ড ছাড়া যুবরাজ থাকতে পারবে না। ওর এতোই আকর্ষণ। ও বস্তুটি কাছ ছাড়া করা তার পক্ষে কখনো সম্ভব নয়। সঙ্গে সঙ্গে একটা চিন্তা তার মনে খেলে গেল। দেবদাসী জেনেছে বালুর ভেতর কোথায় ডায়মণ্ডটা লুকানো রয়েছে। অত্যা ধিক মদ্যপানের ফলে দেবদাসী ও যুবরাজ দু'জনেই হয়তো এক সময় জ্ঞান হারাবে। যুবরাজের জ্ঞান ফিরে আসার আগেই দেবদাসী যদি জ্ঞান ফিরে পায় তাহলে কি হবে। দেবদাসী যদি ডায়মণ্ডের জন্যে পাগল হয়!

বালু খুঁড়ে সে যদি ডায়মণ্ড নিয়ে পালায়। তাহলে উপায়। এক অদৃশ্য শক্তি যুবরাজকে দিশেহারা করে তুললো। ও ডায়মণ্ড হস্তচ্যুত হলে যুবরাজ কখনো বাঁচবে না। তার স্ত্রী মৃত। কে জানে পুত্র বাঁচবে কি না। আর ডায়মণ্ড খোয়া গেলে যুবরাজ নিজেও মরবে।

আর তাই বোধহয় দিশেহারা হয়েই সুরার সঙ্গে যুবরাজ সে রাতে কি যেন মিশিয়ে দিলে। সুরার সঙ্গে সে বিষ পান করে দেবদাসীর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলো। সঙ্গে সঙ্গে লোপ পেল তার স্মৃতিশক্তি।

আনন্দ বেহেরা এবং তার সাথী সঙ্গীরা সে রাতে নেশায় বুঁদ যুবরাজের দেহ তন্ন তন্ন করে খুঁজেছিল, কিন্তু ডায়মণ্ডের সন্ধান তারা পায় নি। বালুর ভেতর তারা আঁতিপাতি করে ডায়মণ্ডের সন্ধান করেছিল। কিন্তু

না। ডায়মণ্ডের সন্ধান তারা পায় নি। পরদিন সকালে যুবরাজ কোণারক মন্দির ত্যাগ করে।

তখন থেকেই কন্যার উন্মাদ অবস্থা। তার স্মৃতিশক্তি লোপ পায়। খবর এসেছিল যুবরাজের পুত্র রোগে মারা গিয়েছে। যুবরাজও আত্মহত্যা করেছে।

ডায়মণ্ড সম্বন্ধে কেউ আর কোনো খোঁজ খবর দিতে পারলো না।

তবু থেকে থেকে আনন্দ বেহেরার মনে লোভটা পাক খেতে শুরু করলো। ওরা সকাল থেকেই যুবরাজের ওপর নজর রেখেছিল। যুবরাজ বেহুঁশ হবার পর ওরা তার সারা দেহে অনুসন্ধান চালিয়েছিল। কিছুই পায়নি। এটা ওদের স্থির বিশ্বাস যে যুবরাজ সকাল বেলা ডায়মণ্ড ছাড়াই কোণারক মন্দির ত্যাগ করেছে। ওদের স্থির বিশ্বাস যে কোণারকের আশপাশের বালুর ভেতর ডায়মণ্ডটা লুকোনো রয়েছে। বালুর ভেতর কোথায় ডায়মণ্ডটা লুকোনো ছিল সে খবর জানতো যুবরাজ আর দেবদাসী। যুবরাজ আত্মহত্যা করেছে। দেবদাসী প্রায় উন্মাদ। তার স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছে। তাহলে উপায় ?

আনন্দ বেহেরা ভাবছে আর ভাবছে।

চিন্তার আর শেষ নেই। শেষ পর্যন্ত সুরাহা একটা হল।

একদিন অকস্মাৎ দেখা হল অর্জুন বহিধরের সঙ্গে। অর্জুন বহিধরকে দেখে আনন্দ বেহেরা চমকে উঠলো। একজনের চেহারার সঙ্গে আর একজনার চেহারার এরকম অদ্ভুত মিল কি করে সম্ভব। মৃত যুবরাজের চেহারার সঙ্গে অর্জুন বহিধরের চেহারার সাংঘাতিক মিল ছিল। শুধু আকৃতি নয়। চলন বলন ভাবভঙ্গী সব প্রায় এক রকম। আনন্দ বেহেরা অর্জুন বহিধরকে দেবদাসীর সামনে উপস্থিত করেছিল। যে মুহূর্তে দেবদাসী অর্জুন বহিধরকে দেখলে সে মুহূর্তে সে কেমন যেন চঞ্চল আর অস্থির হয়ে উঠলো। অর্জুন বহিধরের সঙ্গ পাবার জন্যে তার অস্থিরতার সীমা পরিসীমা রইলো না। এতোদিনে সে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছিলো। এবার অর্জুন বহিধরকে পেয়ে নৃত্য-গীতে

আবার মেতে উঠলো দেবদাসী।

অর্জুন বহিধরকে নৃত্য গীতে খুশী করতে পারলেই তার সুখ। তার তৃপ্তি। দেবদাসীর আত্মীয় স্বজন এ সুযোগ হেলায় হারালো না। তাদের অনুরোধে অর্জুন বহিধর দেবদাসীর সঙ্গে প্রকাশ্যে মেলামশা শুরু করলো। দেবদাসীর কথাবার্তা আর অসংলগ্ন নয়। হারানো কিছু দেবদাসী ফিরে পেয়েছে এ বিষয়ে কারো আর সন্দেহের অবকাশ রইলো না।

সবাই বুঝতে পারলো যে অর্জুন বহিধরের ভেতর দেবদাসী মৃত যুবরাজকে খুঁজে পেয়েছে। ভালবাসার কাঙালিনী হারিয়ে যাওয়া ভালবাসা খুঁজে পেতে চাইছে। দেবদাসী সম্পূর্ণ আরোগ্যের পথে। তার স্মৃতিশক্তি সম্পূর্ণভাবে ফিরে এসেছে। আর এ সুযোগের অপেক্ষায় ছিল আনন্দ বেহেরা। সে এ সুযোগটুকু হাত ছাড়া করতে রাজী হয় নি। কোণারকের নাটমন্দিরে আবার জলসার বন্দোবস্ত হল। ঠিক হল অর্জুন বহিধরকে সম্পূর্ণভাবে যুবরাজের ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করতে হবে। সে রাতে বোধকরি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটলো! নৃত্য গীত আর সুরের মূর্ছনার ভেতর মেয়েটি একসময় বর্তিকা হাতে বালুকার ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল। পেছনে ছিল অর্জুন বহিধর। এ নৈশ অভিযানের জন্যে বারবার অনুরোধ জানিয়েছিল অর্জুন বহিধর। সুরাপান, প্রেমালাপ, চুম্বন ও আলিঙ্গনের ভেতর অর্জুন বহিধর দেবদাসীর অন্তরে এ বিশ্বাসেরই সৃষ্টি করেছিল যে ডায়মণ্ড এখনো বালুভূমির ভেতর লুকোনো রয়েছে। কন্যার মনে থাকা উচিত কোথায় ডায়মণ্ড লুকোনো রয়েছে। আর সে ডায়মণ্ড তাদের পেতে হবে। কন্যার বিশ্বাস জন্মেছিল যে হারিয়ে যাওয়া যুবরাজ অর্জুন বহিধরের ছদ্মবেশে তার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে।

দেবদাসী যুবরাজের মৃত্যু সংবাদ জানতো না। যুবরাজ যখন মারা গিয়েছিল তখন কন্যা ছিল উন্মাদ।

কিন্তু শেষ রক্ষা বুঝি হল না। রাজ গোখরোর নির্মম ছোবলে দেব-

দাসী প্রাণ হারালো। ডায়মণ্ড উদ্ধার সম্ভব হল না। অর্জুন বহিধর সময় মতো টর্চের আলো ফেলেছিল। সাপটা ছিল আট দশ ফুট লম্বা, গায়ের রঙ গাঢ় সবুজ কালোয় মেশানো। তার ওপর ডোরা কাটা সাদার ছোপ। সারা শরীরে ছিল কুলোপানা চক্কর। সাপটা দেবদাসীকে ছোবল দেবার পর ফণা তুলে ফুঁসছিল। তারপর এক সময় কোনো এক গর্তে ঢুকে পড়েছিল। দেবদাসী মারা গেল। সারাটা অঞ্চল তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ডায়মণ্ডের সন্ধান মিললো না।

## ৪

ধৌলি পাহাড় আর তার আশপাশের প্রান্তরে ঝড় ধেয়ে আসে। বাতাসে সোঁ সোঁ শব্দ। কড়াং কড়াৎ করে বজ্র গর্জন। ধৌলি প্রান্তরে এরকম ভাবেই একদিন ঝড় ধেয়ে এসেছিল। ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি। হস্তীর বৃংহন। তরবারির ঝনঝনানি। কলিঙ্গজয়ে এসেছিলেন রাজা অশোক। কলিঙ্গবাহিনীর সঙ্গে অশোকের সৈন্য সামন্তের হল বিরাট এবং ভয়াবহ যুদ্ধ। এখানে মানুষ মানুষকে একদিন নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। মূর্তিমান বিভীষিকার রূপ নিয়ে প্রান্তরে নেমে এসেছিল অজস্র পদাতিক, অশ্বারোহী আর হস্তিবাহিনী।

কলিঙ্গ সৈন্যবাহিনী মৃত্যুপণ করে যুদ্ধ করেছিল। অশোকের সৈন্যবাহিনী জয়ী হয়েছিল। কিন্তু নৃপতি অশোক কি জয়মুকুট মস্তকে ধারণ করে সুখী হতে পেরেছিলেন? ইতিহাসে বলছে—না পারেন নি। যুদ্ধ শেষে তাঁর যে ধরনের মনের পরিবর্তন হল বিশ্ব ইতিহাসে তার বুঝি জুড়ি নেই।

এই কিছুক্ষণ আগেও আকাশ পরিষ্কার ছিল। তারারা মিট্‌মিট্‌ করে জ্বলছিল। পাহাড়ে প্রান্তরে দেখা যাচ্ছিল জ্যোৎস্নার আভাস। সারা আকাশটায় কালো কালো মেঘ পাখনা মেলে উড়ে যাচ্ছিল। তাঁবুর ভেতর থেকে জন আর ক্যাথারিন বেরিয়ে এসেছিল। তারা দু'জন আপোষ আলোচনা মেনে নেয় নি। ঝগড়া-ঝাটিতে মেতে উঠেছিল। ওদের বিপরীতধর্মী চরিত্র। সাহেব এসেছে সমঝোতার হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে। সর্ববিষয়ে বোঝাপড়া সে চায়। সাহেবটা ইতস্তত ছুটোছুটি করেছে। কেমন যেন পাগলা ধরনের সাহেবটা। মাঝে মাঝেই পাথুরে মাটির পরশ। পাথরের চাঁই টপকাতে হচ্ছে ঘনঘন। জনের

সহযোগিতাই একমাত্র কাম্য। শান্তির পূজারী সে। শান্তিপূর্ণ সহ-যোগিতায় সে বিশ্বাসী! হাজার হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে সে এসেছে। সাহেবটার শুধু জানবার প্রয়াস। এ সেই বিখ্যাত ধৌলি পাহাড়। ধৌলি পাহাড় ভুবনেশ্বর মন্দিরের দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত। পাহাড়ের হাতি গুম্ফায় পালি ভাষায় অশোকের শিলালিপি রয়েছে। বহু পুরাতন। খ্রীষ্ট জন্ম আড়াইশো বছর আগেকার পাথরের গায়ে উংকীর্ণ অশোকের শিলালিপি। জন টানটান হয়ে শুয়ে পড়ে মাটিতে কান পেতে কি যেন শুনছে। কি শুনছে? কেন শুনছে? ওখানেই ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছিল। অশোক শৌর্য বীর্যে হয়তো শার্লিমেন কিংবা সিজারের সমকক্ষ। কিন্তু ধর্ম আর নৈতিক আদর্শে ওদের অনেক ওপরে। জন লেখাপড়া জানা জ্ঞানীগুণী মানুষ। কিন্তু বউ ক্যাথারিন কেমন যেন। এ অঞ্চলটা অশোকের সময় ছিল সমৃদ্ধশালী। জনপদ-বহুল। লোকেরা ছিল বীর্যবান। পরাক্রমশালী। মেগাস্থিনিসের হিসেব মতে কলিঙ্গ সৈন্যদলে ছিল ৬০,০০০ পদাতিক। একহাজার অশ্বারোহী আর সাতশো হাতি। অশোকের শিলালিপিতে রয়েছে অরণ্যে শিকা-রের বিবরণ। সেদিন হাতির সম্মান ছিল আকাশছোঁয়া। সামাজিক অনুষ্ঠানে যুদ্ধবিগ্রহে হাতির স্থান ছিল সর্বাগ্রে। আর তাইতো উড়িষ্যার পাহাড়, মন্দির, প্রাচীরগাত্রে ধ্বংসাবশেষে শিল্পকলায় হস্তি এক বিশেষ স্থান দখল করে রয়েছে। কৌটিল্যের হিসেব মতে কলিঙ্গের হস্তিই ছিল সমধিক প্রসিদ্ধ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। তুই জনপদ তোষালি আর সমাপার আশে পাশের অরণ্যে ঘুরে বেড়াতো হস্তিযূথ সারিবদ্ধভাবে।

সেদিনের যুদ্ধে ধৌলি পাহাড়ের আশে পাশের অঞ্চল রক্তে ভিজে উঠেছিল। অশোক তার বিরাট বাহিনী নিয়ে কলিঙ্গ প্রান্তরে একটা বিরাট ঘূর্ণিঝড়ের বেগে ধেয়ে এসেছিলেন। বাহুতে তার অমিত বিশ্বাস। অন্তরে তার প্রচণ্ড আশা আকাঙ্ক্ষা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। সমস্ত বিন্দু পদদলিত করে সমস্ত কিছু জয় করে সে ফিরবে। হাতি গুম্ফায় অশোকের শিলালিপির পাঠোদ্ধারে সারাটা দিন জনসাহেব

রত। খুঁটিয়ে নাটিয়ে সবকিছু দেখবার চেষ্টা। এতো কি পড়ছে জন-সাহেব। অশোকের শিলালিপিতে লেখা রয়েছে—অন্যের ক্ষতিসাধন থেকে বিরত থাকো। কামকে জয় করো। নিরপেক্ষ হও। গম্ভীরভাব পরিহার করে সদা হাসিমুখ ধারণ করো। প্রৌঢ় সাহেব কখনো হাসছে। কখনো পাথরের ওপর মাথা রেখে কাঁদছে।

কাঁদছে কেন? কে বলতে পারে। ক্যাথারিন মেমসাহেবটা কেমন যেন। সাহেবের সঙ্গে কোথাও মিল নেই। প্রকাণ্ড মেয়ে ছেলেটার সমস্ত বিষয়ে একটা গোলমাল সৃষ্টি করবার প্রয়াস। অল্পেতেই সে রেগে ওঠে। চেঁচিয়ে ঘর মাথায় করে। অন্য ট্যুরিস্টের কথা ভেবে দেখে না একবার। জিনিসপত্র নির্বিবাদে ছুঁড়ে ফেলে দেয় যত্রতত্র। সামান্য কথা নিয়ে মাঝে মাঝেই দু'জনের ভেতর তুমুল ঝগড়া। মেম-সাহেব সাহেবটাকে মাঝে মাঝেই কামড়িয়ে আঁচড়িয়ে রক্তাক্ত করে ছাড়ে। ট্যুরিস্টের বাকী দলটা লজ্জায় অধোবদন। ট্যুরিস্ট দলে নরম নরম চেহারার শান্ত লাজুক লাজুক মেয়েটা যখন সন্তর্পণে সাহেবের হাতে টিনচার আওডিন লাগিয়ে দিচ্ছিল তখন ক্যাথারিন মেমসাহেব ফিক করে হেসে সরে গিয়েছিল। সাহেবটার লাল চওড়া রোমশবক্ষ। মেয়েটার অধোবদন। ভুবনেশ্বরে শত্রুঘ্নেশ্বর মন্দিরের পাশেই গোটা দলটা যখন ফটো তুলতে ব্যস্ত তখন সাহেবটা তরকারির খোসা ছাড়াচ্ছে। শত্রুঘ্নেশ্বর মন্দিরের পাশেই পিকনিকের ব্যবস্থা। আর সাহেবটা একাই একশো। জল তুলছে। তরকারির খোসা ছাড়াচ্ছে। ধোঁয়ার ভেতর মুখ বাড়িয়ে উনুনে ফুঁ দিচ্ছে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে তৈরি মন্দির শত্রুঘ্নেশ্বর ভুবনেশ্বর মন্দিরগুলোর মধ্যে প্রাচীনতম। তরকারির খোসা ছাড়াতে গিয়ে সাহেবটা হাতের আঙুলটাকে কেটে ফেললে। ওরা সবাই ফটো তুলতে ব্যস্ত। কিন্তু শ্রীলেখার নজর এড়ায়নি। সে বাক্সের ভেতর থেকে টিন-চার আওডিন আর তুলো বের করে এনে সাহেবের আঙুলের পরিচর্যা করেছিল। সাহেব ভারী খুশী। এ ধরনের ঠাণ্ডা মেয়ের সঙ্গে তার পরি-চয় কম। এরকম ঠাণ্ডা নিরীহ মেয়ে তাদের সমাজে আর ক'জনই বা

দেখা যায়। সবাইকার অজ্ঞাতে সাহেবটা শ্রীলেখার চিবুকে হাতের আঙুলের পরশ বুলিয়েছিল। শ্রীলেখা ঘেমে নেয়ে একাকার। কিন্তু সে আপত্তি করেনি। নির্জন নিভৃতে শ্রীলেখা খানিকটা নিজেকে বিদেশীর হাতে সমর্পণ করেছিল। শ্রীলেখা চোখ তুলে সাহেবের চোখে চোখ রেখেছিল। সেখানে দেখেছিলো। ভূমধ্য সাগরের নীল জলরাশি। আর সাহেবটা শ্রীলেখার চোখে দেখেছিল পদ্মা নদীর শান্ত শীতল জলরাশি। মেমসাহেবটার সাহেবের ওপর নির্যাতনের নমুনা দেখে শ্রীলেখার সাহেবের ওপর মনটা কেমন যেন নরম হয়ে উঠেছিল। ক্রমে ধীরে ধীরে দুর্বলতা ভালভাবে শিকড় গজিয়েছে। শ্রীলেখার আওড়িন বুলোতে গিয়ে হাত কেঁপেছিল। মাথা ঝিমঝিম করছিল। সে স্নায়ু-তন্ত্রীতে এক উন্মাদনা অনুভব করেছিল। এক মাথা রুক্ষ সাদা চুলের অধিকারী যজ্ঞেশ্বর দত্তর নজরটা বরাবর শ্রীলেখার দিয়ে। স্কুল মিস্ট্রেস তন্বী মোটামুটি সুন্দরী মিস শ্রীলেখা বানার্জী গোটা ট্যুরিস্ট দলটার ভেতর আলোড়নের সৃষ্টি করেছে বৈকি। যজ্ঞেশ্বর দত্তর সঙ্গে ট্যুরিস্ট অফিসে শ্রীলেখার আলাপ। দু'জনেই টিকিটের খোঁজে এসেছিল। সে সূত্রে আলাপ।

শ্রীলেখা ব্যানার্জী যজ্ঞেশ্বর দত্তকে দাদা বলে ডেকেছিল। যজ্ঞেশ্বর দত্ত ভোর চারটের সময় লাইনে দাঁড়িয়ে ট্যুরিস্ট বাসের টিকিট যোগাড় করেছিলো। ব্যস তারপর থেকেই যজ্ঞেশ্বর দত্ত শ্রীলেখার ওপর যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়ে।

ট্যুরিস্টের দলটার ভেতর সাহেবের জয়জয়কার। মেমসাহেব কুখ্যাত নারী বলে পরিচিতা। মিসেস তরফদার বলেছিল মেমসাহেব নাকি সাহেবটার ওপর যখন তখন নির্যাতন চালায়। ওর ফন্দী ফিকিরের অভাব নেই।

—আড়ালে আবডালে মারপিট পর্যন্ত করে। বলেছিল ঝুনঝুন প্রসাদ। মালহোত্রা বলেছিল—ওর যা হাতের গুলী এক বিরাশী সিক্কা চড়ে সাহেবের চোয়ালের দাঁতগুলো অনায়াসে নামিয়ে আনতে পারে।

চড়ুইভাতি হচ্ছিল। মুক্তেশ্বর মন্দিরের খুব কাছে ঘাসের ওপর সারি সারি পাতা পড়েছিলো। খাবার গ্রাস গ্রাস মুখে তোলবার সময় কথা হচ্ছিলো। গাইড ততোক্ষণে মুক্তেশ্বর মন্দিরের সুচারু গঠন কৌশল ও বিন্যাস ব্যাখ্যা পর্ব শেষ করেছে। মুক্তেশ্বর মন্দিরের সুচারু গঠন ও কৌশল লোকে বলে ভুবনেশ্বরের সমস্ত মন্দিরগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। মিসেস সেন বলেছিল—মেমসাহেব নিশ্চয়ই মধুচন্দ্রিমার দিনে মধুনিশি যাপন করে নি। মিসেস সেন সাংঘাতিক আধুনিকা। বসেছে মালহোত্রার গা ঘেঁষে। অনেকটা দূরে স্বামী মিস্টার সেন বসেছে মিসেস মালহোত্রার পাশে।

জনা বিশেকের পার্টি। ট্যুরিস্টের খাতায় নাম লিখিয়েছে সবাই! ট্যুরিস্ট বাসে ওঠবার সময় কারু সঙ্গে কারুর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না। সারা ওড়িষ্যার ট্যুরিস্ট স্পটগুলো ঘুরে ঘুরে দেখবার ফাঁকে ফাঁকে এদের ভেতর আলাপ পরিচয়ের সুযোগ ঘটেছে। ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। ঘনিষ্ঠতার বেড়া ডিঙ্গিয়ে রোমান্সের হাওয়া টুক করে এক সময় ঘরে ঢুকে পড়েছে। কোথাও এরা হোটেলে থেকেছে। কোথায়ও বা ট্যুরিস্ট লজে। আবার কোথাও ক্যাম্প খাঁটিয়ে মুক্ত আকাশের নিচে। সমস্ত দিনের প্রোগ্রাম এদের। এরা যেন মুক্ত বিহঙ্গ বিহঙ্গী। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে এরা ঘুরে বেড়ায় সর্বত্র! সঙ্গীত, সাহিত্য, নাট্যকলা, সমাজ, সংসার, রাজনীতি এদের আওতা থেকে কোনো কিছুই বাদ পড়ে না। পরিবেশ কখনো সুন্দর। কখনো কুৎসিত। জনঅরণ্যে যাদের বিশ্বাস নেই বা ভালো লাগে না তারা একলা হয়ে যায়। নিরিবিলি খোঁজে। আশা আকাঙ্ক্ষার দোলায় দোলে।

নারী পুরুষ দলছাড়া হলেই নারীকে পুরুষের তুলনাহীন মনে হয়। যদি অবশ্য পুরুষটি স্বামী না হয়। বনের ভেতর দিয়ে চলার সময় মনের সঙ্গে মনের খেলা চলে। অলস ভ্রমণটুকু বড়ই সুখপ্রদ মনে হয়। অচেনা মানুষটি কাছে সরে আসে। পরস্পরটের পায় বুকের ভেতর ধিক্ ধিক্ করে জ্বলা আগুন জোরে জ্বলে উঠেছে!

অচেনা মানুষ কাছে সরে আসে। সমাজের নির্দিষ্ট বৃত্তের বাইরে আসবার সুযোগ পেয়ে মনটা খুশী হয়। মিসেস সেন আর মিস্টার মালহোত্রা ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। উল্টোদিকে ঘনিষ্ঠ হচ্ছে মিসেস মালহোত্রা আর মিস্টার সেন। চারজনের বয়সই ত্রিশের ঘরে। স্ত্রীরা বেশ ভালো করে বুঝে নিয়েছে স্বামীদের মনের গতি—কোন্‌দিকে। স্বামীরা বুঝেছে—স্ত্রীরা নিজেদের স্বচ্ছন্দে স্রোতের মুখে ছেড়ে দিয়েছে। বাধা দিয়ে লাভ নেই। বরং প্রত্যেকেই সুযোগ সুবিধার সমান অধিকারী। মিসেস মালহোত্রা এবং মিসেস সেন দু'জনেই সুন্দরী। উগ্র আধুনিকা। মনে হয় দু'জন দু'জনকে হিংসে করে। এ কদিন কেউ কারু সঙ্গে একটা কথাও বলে নি।

মধ্যযুগের ক্যাথেড্রেল আকৃতির রাজারাণী মন্দির পরিদর্শন কালে একটা কাণ্ডই ঘটলো। নির্জনতা আর প্রায় অন্ধকার পরিবেশের সুযোগ নিয়ে তরুণ ছেলেটি, বয়স কতো হবে, বড় জোর বাইশ, জয়ন্তীর হাতে টুক্‌ করে একটি ছোট্ট চিঠি চালান করেছিল। চিঠিটা চালান করে দিয়ে ছেলেটা হাওয়া।

হাতের মুঠোর ভেতর চিঠিটা নিয়ে জয়ন্তী ঘামতে শুরু করলে। ট্যুরিস্ট দলের যাত্রা শুরু হবার দিনটি থেকেই এই তরুণটি জয়ন্তীর ওপর বড্ডো দুর্বল হয়ে পড়েছে।

জয়ন্তী তরুণটি থেকে বয়সে অনেক বড়।

কলকাতার এক কলেজে জয়ন্তী পড়ায়। সেখানে ছেলেটি বি.এ. ক্লাশের ছাত্র। ক্লাশে পড়াবার ফাঁকে ফাঁকে ছেলেটির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই জয়ন্তী বুঝে নিয়েছিল তরুণটির পাঠ্য। পুস্তক বা পাঠের দিকে মনোযোগ নেই। তার দৃষ্টি ইঙ্গিত দিচ্ছে—অন্য কিছুর। অথচ জয়ন্তী কম করে ছেলেটি থেকে বছর আটেকের বড়। জয়ন্তী অস্বোয়াস্তি বোধ করছিল। এর পর ছল ছুতো করে পুরুষোত্তম জয়ন্তীদের বাড়িতে এসেছে। পাঠ বুঝে নেবার ছুতো করে থেকে গেছে জয়ন্তীদের বাড়ি বেশ খানিকটা সময়। জয়ন্তী সব বুঝেও না বোঝার ভান করেছে। এবং আকারে

ইঙ্গিতে জয়ন্তী বোঝাতে চেষ্টা করেছে যে এ পাগলামীর কোনোরকম মানে হয় না। ছেলেটি যেন বুঝেও বুঝতে চায় নি। শুনেও শোনেনি কিছু। ক্লাশে পাঠ সংক্রান্ত নানা রকম প্রশ্ন তুলে জয়ন্তীর দৃষ্টি তার প্রতি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছে। এরপর দামী প্রেজেণ্ট কিনে দু দুবার জয়ন্তীকে উপহার দিতে গেছে। জয়ন্তী দু'বারই উপহার ফেরত দিয়েছে।

জয়ন্তী স্পষ্ট বলে দিয়েছে ও সবের কোনো মানে হয় না। দু'দিন ছেলেটি মেট্রোর টিকিট কিনে সড়কের ওপর দাঁড়িয়েছিল জয়ন্তীর জন্যে। দু'দিনই জয়ন্তী টিকিট কুচিকুচি করে ছিঁড়ে রাস্তায় ছড়িয়ে দিয়েছে। ছেলেটি কলেজ যাবারসময় একই বাসে তার পাশে বসবার চেষ্টা করলে রুক্ষ ভাষায় ওকে অন্য সীটে বসবার হুকুম দিয়েছে। ও মাথা নিচু করে চলে গিয়েছে। ছেলেটি কিন্তু চিরদিনই নীরব। নম্র স্বভাবের। বিনয়ী। কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

নাছোড়বান্দা। যে পথ সে বেছে নিয়েছে সেখান থেকে সে সরে অন্য পথ ধরবে না! সে তার চেয়ে কমপক্ষে আট বছরের বড়ো স্ত্রীলোক-টির প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলো। আকর্ষণ রজ্জু ছিন্ন করবার শক্তি তার ছিল না। আর জয়ন্তী সব কিছু বুঝেও সযত্নে নিজেকে সরিয়ে রেখেছে। প্রতি ক্ষেত্রে সে বাধা দিয়েছে। এক মুহূর্তের জন্যে সে নরম হয় নি। কোথাও সে আবেগপ্রবণ হয় নি। বরাবর রূঢ় ভাষায় কথা বলে এসেছে। শুধু একটি কাজ সে করে নি। কলেজ কর্তৃপক্ষকে সে এ বিষয়ে কখনো কিছু জানায় নি।

জানায় নি তার পরিবারের লোকজনদের। নিজের ওপর তার আত্ম-বিশ্বাস প্রচণ্ড। নিজেকে রক্ষা করবার শক্তি সে রাখে। না হলে এতো দিনে সে অন্য কোনো পুরুষের বাহুলগ্না অনায়াসেই হতে পারতো। তার রূপ রয়েছে, যৌবন রয়েছে।

কিন্তু আপাতত গৃহিণী হবার সময় আসে নি। সে আরো পড়াশুনো করে বিদেশে যেতে চায়।

ডক্টরেট ডিগ্রী নিতে চায়। কিন্তু তরুণটিকে ট্যুরিস্ট বাসে দেখবার পর জয়ন্তী তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো। সে তরুণটিকে ট্যুরিস্টদের ভেতর আশা করে নি। জয়ন্তী ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করার জন্যেই এ যাত্রা শুরু করেছিলো। সমস্ত উড়িষ্যা ঘুরে উড়িষ্যার পুরোনো ঐতিহ্য সংস্কৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করাই তার উদ্দেশ্য ছিল। ডক্টরেটের জন্যে পেপার জমা দিতে হবে। সে জন্যেই এতো মেহনত। একলা বেরিয়ে পড়া ওই উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু যাত্রা কালে একই বাসে ওকে দেখে মনটা বিগড়ে গেল। যাক্ ওর সঙ্গে সারাটা রাস্তা কথাবার্তা বলে নি জয়ন্তী। ছাত্রটির স্পর্ধা আকাশছোঁয়া। জয়ন্তী ভেবে রেখেছে ছেলেটি বাড়াবাড়ি করলে সে পুলিশে ডায়েরী করবে।

জয়ন্তী কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলো না পুরুষোত্তম কি করে জয়ন্তীর এ যাত্রার কথা জানতে পারলে। বাড়ির লোক ছাড়া এ যাত্রার কথা আর কেউ জানতো না। বিস্মিত হল জয়ন্তী। সে বুঝতে পারলে যে ছেলেটি গভীর জলের মাছ। জয়ন্তীর চেয়ে অনেক বেশী খোঁজ খবর সে রাখে। মোটেও ভিজে বেড়াল নয়। জয়ন্তী কথা না বললে কি হবে ছেলেটি মন্দির দর্শনকালে যেচে কথা বলেছে। জয়ন্তী কখনো উত্তর দিয়েছে। কখনো উত্তর দেয় নি। তবে জয়ন্তীর দু'চারটে খুচরো জিনিষের দরকার হয়েছিলো। মিস্টার মালহোত্রাকে জিনিষগুলোর কথা জয়ন্তী যখন বলছিলো তখন ছেলেটি তার ফর্দ শুনে নিয়েছিলো। পরদিন জয়ন্তী যতটা বিস্মিত ততোধিক বিপন্ন। ছেলেটি ভুবনেশ্বরে গিয়ে প্রতিটি জিনিষ কিনে এনেছে ! এনে জয়ন্তীর কাছে রেখে দিয়েছে। জয়ন্তীর উপায় ছিল না। জিনিষগুলো সে নিয়েছে। কিন্তু টাকা সে ওর হাতে দেয় নি। ওর উদ্দেশ্যে একরকম ছুঁড়েই দিয়েছে। প্রতিটি টাকা ছুঁড়ে দেবার সময় নিজেকে উজাড় করে ওর উদ্দেশে মুঠো মুঠো বিরক্তি অবহেলা আর বিতৃষ্ণা ছুঁড়ে দিয়েছে। পুরুষোত্তম গ্রাহ্য করে নি। নিচু হয়ে এক-টাকা পাঁচটাকার নোটগুলো ভূমি থেকে কুড়িয়ে নিয়েছে। ওর নোট গোণা শেষ হলে জয়ন্তী বিশ্রীভাবে বলেছে—সব কিছুরই সীমা আছে।

একটু বেশী বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। শীগ্‌গীরই উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে আমাকে। তরুণ একটি কথারও জবাব দেয় নি। খানিকক্ষণ জয়ন্তীর চোখে চোখ রেখে শেষে নীরবে বিদায় নিয়েছে। বিরক্তি আর আক্রোশে ভরে উঠেছে জয়ন্তী। আজ মন্দিরের ভেতর এ চিঠিটুকু হাতে গুঁজে দেবার পর পরিস্থিতি জয়ন্তীর কাছে অসহ্য বলে বোধ হয়েছে। আর নয়। তাকে যবনিকা টানতেই হবে। চিঠিতে কি আছে—জয়ন্তী জানে। পুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া চিঠিতে আর কি থাকতে পারে। সে একই বস্তু। তোমাকে ভালবাসি। তোমাকে ছাড়া জীবনধারণ অসহ্য হয়ে উঠেছে। রাবিশ! জয়ন্তী চিঠি খুলে পড়বার প্রয়োজন বোধ করে না। চিঠিটা ছিঁড়ে পথের ধুলোর ওপর ছড়িয়ে দেয়। বাজে সেন্টিমেণ্টের কোনো অর্থ হয় না। তাছাড়া একটা তরুণের সঙ্গে রোমান্স। প্রেম। যে ছেলে তার চেয়ে কম করে আট বছরের ছোটো।

এরি ভেতর মিসেস সাকসেনা একটা চমকপ্রদ কাহিনী শোনালে। গত-কাল ধৌলি পাহাড় থেকে মেমসাহেবটা নাকি সাহেবটাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে চেয়েছিলো। ওখান থেকে পড়ে গেলে সাহেবটার হাড়গোড় আর আস্ত থাকতো না। মোটকথা গোটা ট্যুরিস্টের দলটা সাহেবের জন্যে চিন্তিত দুঃখিত। বেচারা ভালমানুষ। কারু সাতে পাঁচে নেই। যে যেটুকুন ফরমাস করছে সাহেব খুশীমনে সমস্ত কাজ সমাধা করছে। এইতো গতকাল মিস ব্যানার্জীর জন্যে টুথপেস্ট, মালহোত্রার ওষুধ, প্রসাদের থার্মোমিটার, মিসেস সেনের চুলের নেট সাহেব ভুবনেশ্বরের বাজার থেকে নিয়ে এসেছে। এরই ভেতর মিস্টার কর্মকার মেমসাহেব এবং সাহেব সম্বন্ধে একটা গুপ্ত খবর ফাঁস করে দিয়েছে। অনেকেই নাকি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। কর্মকার বললো—গত পরশু একটু বেশী রাতে প্রকৃতির ডাকে সাহেব তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসেছিলো। মালহোত্রা জানালে—আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল।

—এক ফালি চাঁদ মেঘের আড়াল থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসেছিলো। বলে মিস বানার্জী। মিসেস মালহোত্রা বললে—দূর থেকে শূন্য প্রান্তরের

অনেকটা স্থানই চোখে পড়েছিলো। খানিকটা এগুতে পরিষ্কার দেখলাম সাহেবটার কাঁধে মেমসাহেবটা দিব্যি চড়ে বসে আছে। ওই সঙ্গে আরো খানিকটা যোগ করলে মিস্টার কর্মকার।

—স্পষ্ট দেখলাম সাহেবটা ওকে কাঁধে চড়িয়ে দিব্যি সারাটা প্রান্তর টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

—তুমি যে কাল রাতে তাঁবুর ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে সবাইকার সঙ্গে জড়ো হয়েছিলে সেকথা তো বলোনি আমাকে।

মিসেস কর্মকার কথার মাঝখানে টিপ্পনী কাটে। ওই লাজুক লাজুক চেহারার মেয়েটাকে তার যতো ভয়। স্বামীর চেহারা ভালো। তেমনি খারাপ দেখতে মিসেস কর্মকার।

খুবই কুৎসিৎ। তবুও নাকি দু'জনের ভেতর প্রেম হয়েছিলো। আর তার পর লাভ ম্যারেজ। এখন মিস্টার কর্মকার পস্তাচ্ছে।

আর মিসেস কর্মকার স্বামীকে পাহারা দিতে দিতে নাজেহাল। কাঁহাতক আর পারা যায়।

—মধ্য রাতে বাথরুমে যেতে হলে তোমাকে নোটিশ দিতে হবে নাকি। কর্মকারের উত্তপ্ত কণ্ঠস্বর। সবাইকার সামনে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু হয়েছে।

বাথরুমে যাওয়া আর তাঁবু ছেড়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে বেরিয়ে আসা অন্য কথা। কত রকম বিপদ আপদ ঘটতে পারে।

গোটা দলটার ভেতর চাপা হাসির ঢেউ বয়ে যায়।

মিস্টার বানার্জী বললে—শুরু হলো তো পারিবারিক কলহ। মিস্টার কর্মকার শুরু করুন তো আপনার কাহিনী। মিস্টার কর্মকার শুরু করে —পরিষ্কার দেখলাম সাহেবটার কাঁধে মেমসাহেবটা দিব্যি চড়ে বসে আছে আর সাহেবটা ওকে নিয়ে সারাটা প্রান্তর চক্কর দিচ্ছে। অনেকেই সমর্থন করলে মিস্টার কর্মকারকে।—চমৎকার। কালে কালে কত কিছুই দেখতে হবে। বলে ডক্টর মিত্র।—সাহেবটা বোধ করি মেমসাহেবটাকে দেবী পাদহরা পুষ্করিণীর গল্প বলেছে, বলে সেনবাবু।

—সাহেব জ্ঞানী মানুষ। প্রচুর পড়াশুনো করেছে। ইতিহাস সম্বন্ধে তার পরম আগ্রহ। বলে প্রসাদ।—তাই বোধ করি মেমসাহেবের সখ হয়েছে—সাহেবের কাঁধে চড়বার। বলে মিসেস ব্যানার্জী।

—ডক্টর মিত্র। আপনি তো ইতিহাসের ছাত্র। ইতিহাসে ডক্টরেট। আপনার নিশ্চয়ই দেবী পাদহরা পুষ্করিণী সম্বন্ধে কিছু জানা আছে।

—আমি এ অঞ্চল এবং তার আশপাশ নিয়ে সম্প্রতি রিসার্চ করছি। শুনুন তবে। ডক্টর মিত্র শুরু করে—দেবী পাদহরা পুষ্করিণী শ্রীলিঙ্গ রাজ মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের অনতি দূরে পূর্ব দিকে অবস্থিত।

মিসেস সাকসেনা বলে—ওই লিঙ্গরাজ মন্দিরের অপূর্ব গঠনকৌশল দেখে আমি তো বিহ্বল। মিসেস সাকসেনা কলকাতায় মানুষ। চমৎকার বাংলা বলে।

—জানেন তো মন্দিরটা একাদশ শতাব্দীতে তৈরী হয়েছিলো। জয়ন্তী লজ্জা ঝেড়ে ফেলে বলে ওঠে।

ডক্টর মিত্র বলে চলে—পুরাণে লিখিত আছে কীর্তি ও বাস নামে দুইটি অসুর কামপরায়ণ হয়ে দেবী পার্বতীকে আলিঙ্গন করতে চায়। দেবী এতে ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন যে তারা যদি তাকে স্কন্ধে করে পঞ্চক্রোশ ঘুরিয়ে আনে তবে তাদের কামনা পূরণ করবেন। মিস্টার সেনের কাহিনীটি জানা আছে।—তুমি ডক্টর মিত্রকে বলতে দাও না। উনি ইতিহাসের ডক্টরেট। তোমার চেয়ে ওর ইতিহাসের জ্ঞান অনেক অনেক বেশী। বলে মিসেস সেন। মিস্টার সেন কেমন যেন মিইয়ে যায়। এই অল্প কয়েক দিনের ভেতর ডক্টর মিত্রের ওপর মিসেস সেনের কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গেছে। মায়া না বলে আসক্তিও বলা চলে। শান্ত-শিষ্ট লাজুক ভদ্র মাঝবয়সী রুচিসম্পন্ন পুরুষ ডক্টর মিত্র। জামা-কাপড় পরবার ধরনটি নিখুঁত। ডক্টর মিত্র ব্যাচেলার।

বড় বড় চোখ তুলে ডক্টর মিত্র যখন তাকায় মিসেস সেনের প্রতি তখন মিসেস সেনের মনটা কেমন করে ওঠে। মিসেস সেনের মনে হয় যেন কলেজ জীবনে ফিরে গিয়েছে। একরাশ লজ্জা এসে বয়স্কা মিসেস

সেনকে ঘিরে ধরে। দৃষ্টি আপনা থেকে নেমে আসে মাটির দিকে। এক কন্যার বিয়ে হয়ে গেছে তবু কেন মিসেস সেনের এ চিত্তদৌর্বল্য।

ডক্টর মিত্র আবার শুরু করে—অসুর ছুটি দেবীকে কাঁধে করে ঘুরিয়ে আনলে দেবী তাদের পদ দ্বারা চাপ দিয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলেন। এতে সেখানে গর্ত হয়ে পুষ্করিণীর সৃষ্টি হয়। তাকে পার্বতী সাগরও বলা হয়।

মিস্টার সেন চুপি চুপি বলে মিস্টার মালহোত্রাকে।

—তাহলে বলতে হবে সাহেবটা কামপরায়ণ হয়ে উঠেছিলো। আর আমাদের দেবী মানে ওই মেমসাহেব তাকে শাস্তি দেবার জন্যে মেম-সাহেবকে কাঁধে চড়িয়ে সারাটা প্রান্তর চক্কর দিতে বলেছিলো। দু'জনে হো হো করে হেসে ওঠে।

মালহোত্রা সেনের দিকে সিগার বাড়িয়ে ধরে। বৈতাল শিবমন্দিরে চাতালে হাত ধরাধরি করে বসে গল্প করছিল রেখা আর প্রণবেশ।

ওদের আলাপ ট্যুরিস্ট বাসে। রেখা কলেজের ছাত্রী। বাবা-মার সঙ্গে উড়িষ্যা ভ্রমণে এসেছে।

ফিজিক্সের ছাত্র প্রণবেশ রেখাকে শোনাচ্ছিলো পরমাণুর ইতিহাস। কত কথা। রেখা ভুলে গিয়েছিলো আশ-পাশের সমস্ত কিছু। বিজ্ঞানের প্রতি তার চিরদিনই ভীষণ অনুরাগ। আর প্রণবেশ এতো সুন্দর করে বুঝিয়ে বলে। প্রণবেশ বলেই চলেছে। দুইশত কোটি বছর আগে পৃথিবীর কোনো এক আদিম জলাভূমিতে প্রাথমিক জীবন-কণা সৃষ্টি হয়েছিলো। ভৌত পদার্থের মূলীভূত সত্তা যে পরমাণুই একথা ঋষি কণাদই প্রথম বলেছিলেন। সেই কোন্ আদি যুগ থেকে মানুষ পদার্থের ক্ষুদ্রতম সত্তার সন্ধান করে ফিরেছে।

আলফা বিটা কণিকা ও গামা রশ্মি সম্পর্কে অনেক কথা শোনায় প্রণবেশ। আর শোনায় পরমাণুকে গুঁড়িয়ে দেবার যন্ত্রের কথা। প্রোটন ও নিউট্রন যাকে বলা হয় কেন্দ্রীন বা Nuclious কেন্দ্রীনে প্রোটন ও নিউট্রন পরস্পর পরস্পরকে প্রচণ্ড শক্তিতে বেঁধে রেখেছে। পারমাণবিক বজ্রবন্ধন! পরমাণু চুল্লীতে বা পরমাণু বোমায় ও বন্ধনকে ছিন্ন করে

দেওয়া হয়।

ওদের ওরকম পাশাপাশি বসে থাকতে দেখে লজ্জায় মরে যায় মিস ঘোষ। বয়স তার পঞ্চাশের ঘরে। একটি মেয়ে কলেজের প্রিন্সিপাল। মিস ঘোষ ভাবে দেব মন্দিরে একি অনাসৃষ্টি। লজ্জা-সরমের বালাই নেই। এ মেয়ে তার কলেজের ছাত্রী হলে মিস ঘোষ দেখে নিতো একবার। তার নিজের কলেজে ডিসিপ্লিনের কড়াকড়ি বড্ডো জোর। সেখানে মেয়েরা মিস ঘোষের প্রতাপে অতিষ্ঠ। সন্ত্রস্থ। স্বামী স্ত্রী নয়। কি করে এরা এরকমভাবে জড়াজড়ি করে বসে থাকে। অবিবাহিতা মিস ঘোষের চিন্তার বাইরে। তার কলেজে হোস্টেলের চৌহদ্দির ভেতর পুরুষ মানুষের আসা নিষিদ্ধ। এ জাতটাকে সে কিছুতেই বিশ্বাস করে নি। ফলে তার কলেজ হস্টেলের মেয়েরা যখন তখন কলেজ থেকে বেরুতে পারে না। পরপুরুষের সঙ্গে দেখা করা বারণ। এমনকি মেয়েদের ভাই কাকা জ্যাঠা পর্যন্ত কলেজ হস্টেলে সহজে ঢুকতে পায় না। এ নিয়ে অনেক মন কষাকষি। অনেক বাদানুবাদ। তর্কের ঝড়। মেয়েরা একবার স্ট্রাইক পর্যন্ত করেছিলো। মফঃস্বল শহরের ম্যাজিস্ট্রেট মিস সেনের সঙ্গে নিভৃতে বসে তাকে অনেকটা সময় বুঝিয়েছিলো! কিন্তু মিস সেন কিছুতেই মানতে পারে নি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কথা। অবিবাহিতা মেয়েদের স্বাধীনতা। পুরুষের সঙ্গে দেখাশুনো। মেলামেশা এ মিস সেনের চিন্তার বাইরে। এ জন্যে সে নিজে বিয়ে পর্যন্ত করলো না। পুরুষ মানুষ তার অফিস ঘরে কথাবার্তার জন্যে এলে পর্যন্ত মিস সেন বিরক্ত বোধ করে। তার ঘর ভরে মহাপুরুষদের সব আলেখ্য। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। বিবেকানন্দ। শ্রীঅরবিন্দ এবং আরো অনেকের ছবি রয়েছে। বৈতাল শিবমন্দিরটি জাহাজের অনুকরণে গঠিত। একটা দিন ট্যুরিস্টের গোটা দলটা ভুবনেশ্বরের চারপাশ ঘুরে-ফিরে দেখেছে। কাল ভোরে তাঁবু তুলে ওরা অন্য জায়গার উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। মিস ঘোষ কোনো মন্দিরের দিকেই চোখ তুলে তাকাতে পারে না। সমস্ত দেয়ালচিত্র তার কাছে অসহ্য বোধহয়। ব্রহ্মেশ্বর মন্দিরে দেয়ালচিত্রে

রয়েছে প্রেমিকা দরজা খুলে রেখে প্রেমিকের জন্যে অপেক্ষা করছে মুক্তেশ্বর মন্দিরে একনারী অশোক বৃক্ষের নীচে পুরুষের জন্যে অপেক্ষ করছে। রাজরানী মন্দিরে নারী প্রেমপত্র লিখছে প্রেমিকের কাছে। লিঙ্গরাজ মন্দিরে মিস ঘোষ দেখেছে নারী নৃত্যগীতে রত। প্রেমিকের জন্যে চলেছে হা হুতাশ। অসহ্য। অসহ্য। মিস ঘোষ ঠিক করেছে সে কিছুতেই কোণারক মন্দির দর্শনে যাবে না। চিন্তাভাবনায় অশুচিতা ঢুকে পড়লে সে কি নিয়ে বাঁচবে। সে কি করে কলেজ চালাবে। কলেজের ছাত্রীদের শৃঙ্খলতার নাগপাশে বাঁধবার দায়িত্ব যে তার।

## ৫

অনেকদিন পরে আবার হুমার বাংলোতে অর্জুন বহিধরের সঙ্গে দেখা হলো। আমাকে পেয়ে অর্জুন বহিধর মহা খুশী। হুমা গ্রাম সম্বলপুরের দক্ষিণে চৌদ্দ মাইল দূরে মহানদীর তীরে অবস্থিত। শিবরাত্রি উপ-লক্ষে পাহাড়ের নীচে এখানে এক বিরাট মেলা বসে। চারদিক থেকে প্রচুর লোকজন এ মেলায় আসে। অনেক রকম জিনিষপত্র এখানে বেচাকেনা চলে। আমি এর আগে আর একবার মেলা দেখতে এখানে এসেছিলাম। এবার অবশ্য মেলার সময় আসি নি।

এখানে সোনেপুর—আর ধামা থেকে আসে গুড়। তুলো, তসর, হাতে বোনা কাপড় আসে বর পলি। বরগড় আর সোনেপুর থেকে। তামা, পিতল-কাঁসার বাসন আসে কানটিলো সম্বলপুর আর বালাঙ্গির থেকে। বাঁশ আর কাঠের তৈরী নানারকম জিনিষপত্র এবং খেলনা আসে সম্বলপুর আর কাডোভাল থেকে।

এবার বর্ষাকালে এসেছি। দেখেছি মহানদীর ভয়াল ভয়ঙ্কর রূপ। মহানদী ফুঁসছিলো। গর্জাচ্ছিলো। আছড়াচ্ছিলো। দাবড়াচ্ছিলো। বর্ষার ঢল নেমেছে মহানদীতে।

অর্জুন বহিধর গ্লাশে ঘন ঘন মদ ঢেলে গলাধকরণ করছিলো। আমাকে বারবার মদ্যপানের অনুরোধ জানিয়েছিলো। আমি ও রসে বঞ্চিত। দেওগড়ের প্রাসাদে আমি সে কথা আগেই জানিয়ে দিলাম। অর্জুন বহিধর সে কথা বেমালুম ভুলে বসে আছে। নানা রকম কথাবার্তা হচ্ছিলো। আমি দেওগড়ের সে রাতের ঘটনা ইচ্ছে করেই উত্থাপন করি নি। ভেবেছিলাম ওসব কথা এক সময় উঠবেই। দেখাই যাক না অর্জুন বহিধর আজ কোন্ গল্পের অবতারণা করে। গল্প বলতে অর্জুন কখনো পেছপা হবে না।

আমি ঠিকই বলেছিলাম। এক সময় অর্জুন শুরু করে—বিশ্বাস করবেন

কিনা জানিনে। একবার বর্ষাকালে হুমার এই বাংলোতে থাকাকালীন ওই মহানদীর সর্বনাশা স্রোতের ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। আমি ঠাট্টা করে বলেছিলাম।

—আত্মহত্যার প্রচেষ্টা নাকি ?

—না। না। তা নয়। একটি মেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলো তাকে বাঁচাবার চেষ্টায় জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। গল্পের গন্ধ পেয়ে নড়ে-চড়ে বসলাম। বহ্নিধরকে পুরো গল্প বলবার জন্যে চেপে ধরলাম। বহ্নিধর গল্প বলবার মুডে ছিল। সে শুরু করলো।

—বড্ডো সাহস করেই মহানদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। মহানদীর এ অঞ্চলটাতে বিশেষ করে ঘূর্ণি স্রোতের আধিক্য বড্ডো বেশী। সারাটা বুক জুড়েই ঘূর্ণি স্রোতের আধিপত্য। সম্বলপুর সাবডিভিসনের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত থেকে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত প্রায় ১২২ কিলোমিটার এ নদী বয়ে এসেছে ! পদমপুর আর সম্বলপুরের মধ্যি-খানে মহানদীর বুক জুড়ে বিরাট বিরাট পাথরের চাঁই দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখানে নদী বলতে মাঝি-মাল্লাদের কাছে এক দুঃস্বপ্ন বিশেষ।

—ভূগোল পড়াতে শুরু করলেন। হেসে বললাম। বহ্নিধর এতটুকুও দমলো না।

বলেই চললো '—সম্বলপুরের দশ কিলোমিটার দক্ষিণে কানসামরার কাছে নদী ভীষণ খরস্রোতা। দুর্বার গতিতে মহানদী বয়ে চলেছে। আরো দক্ষিণে হুমার কাছে পাহাড়-বেষ্টনীর ভেতর দিয়ে খাঁড়ির ভেতর জল ঢুকে গেছে। জানেন বোধকরি সম্বলপুরের পঞ্চম রাজা বালিয়ার সিং একটি শিবমন্দির বানিয়েছিলেন। ওই মন্দিরের আশে-পাশেই মেলা বসে। মন্দিরটির বিশেষত্ব হল মন্দিরটি হেলে রয়েছে। ইটালীর পিসাতে হেলে থাকা টাওয়ারের মতো।

—বহ্নিধর সাহেব। আমি আবারও বলছি নদীর গতিপথ আর তার মতিগতি সম্বন্ধে আমি মোটেই আগ্রহান্বিত নই। রাজা মহারাজা সম্বন্ধে আমি কিছু জানতে চাইছি নে। আমি শুধু জানতে চাই মেয়েটি কেন

আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলো।

—শুধু নারী। প্রেম উপাখ্যান শুনলে চলবে কেন। এখানে এসেছেন। সব দেখুন। জানুন। পশ্চিম উড়িষ্যা সম্বন্ধে কিছু জানানোর ব্যাপারে আমারও খানিকটা দায়িত্ব রয়েছে বৈকি। মহানদী সম্বন্ধে দু'চার কথা না বলা আমার পক্ষে নেহাত অন্যায় করা হবে।

—বলুন আপনি যা বলতে চাইছেন।

—মহানদীর কথা না বললে উড়িষ্যার কথা বলা সম্পূর্ণ হয় না। আর জানেন বোধ করি যে এই নদী উপত্যকায় মনুষ্য সভ্যতা গড়ে উঠেছে। একদিন টাইগ্রিস ইউফ্রেটিস নদীকূলে গড়ে উঠেছিলো ব্যাবিলোনিয়ান সভ্যতা। নীল নদের কূলে মিশরীয় সভ্যতা। হোয়াং হো আর ইয়াং সি নদীর কূলে চাইনীজ সভ্যতা। আর গঙ্গার কূলে ভারতীয় সভ্যতা। আর সিন্ধুর কূলে মহেঞ্জোদারোর সভ্যতা। মহানদীর কূলে গড়ে উঠেছে উড়িষ্যার সভ্যতা। পশ্চিম উড়িষ্যার এই নদীর তীরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কতো মন্দির। সোমেলেশ্বরী, গোপালজী, পটনেমশ্বরী, বড় জগন্নাথ, অনন্তশয্যা, রামজী ব্রহ্মপুরা, বুধারাজা, বিমলেশ্বর।

—মহানদীর বিষয়ে যখন বলতে চাইছেন বলে যান। আমি বাধা দেবো না। বলি আমি।

—মধ্যপ্রদেশের রায়পুর ডিস্ট্রিক্ট থেকে উঠে এসে এবং ৫১,০০০ স্কোয়ার মাইল উপত্যকাকে সিঞ্চিত করে মহানদী পাঁচশো তেত্রিশ মাইল দীর্ঘ পথ বয়ে চলেছে। ১৯৩৭, ১৯৫৫, ১৯৬১ সালে মহানদী ভাসিয়ে দিয়েছে গোটা প্রদেশটাকে তাইতো একে বাঁধবার জন্যে এতো তোড়জোড়।

—আজকে উড়িষ্যার আর এক তীর্থস্থান হীরাকুঁদ ডাম। দৈর্ঘ্যে পৃথিবীর প্রথম। এই একশো কোটি টাকার multipurpose River Valley Project দুস্তরে নির্মিত। প্রথম হীরাকুঁদ দ্বিতীয় চিপিল্লিমায়।

—মহানদী এমনিতে ভালো। শান্ত সুবোধ ছেলের মতো। কিন্তু যখন মহানদী তাণ্ডব নৃত্যে মেতে উঠতো তখন বড্ডো ভয়ঙ্কর। রক্ষা করলো রাজ্যটাকে ঐ হীরাকুঁদ ডাম।

সম্বলপুর থেকে মাত্র ষোলো কিলোমিটার দূরে তৈরী হয়েছে ওই জগত বিখ্যাত হীরাকুঁদ ডাম।

অর্জুন বহিধর রুমাল বের করে কপালের ঘাম মোছে। সে ঘন ঘন মদ্যপান করছে।

—আমরা এতোদিন জানতাম পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দির। কোণারকের সূর্য মন্দির। ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির। এখন জেনেছি হীরাকুঁদ বাঁধ। রুরকেল্লার ইস্পাতনগর। জানেন বোধকরি হীরাকুঁদের এ বাঁধ এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ষোলো মাইল দীর্ঘ। এর সাহায্যেই বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে।

আমি বলি—শুনেছি এর সাহায্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ যেমন সম্ভব হয়েছে তেমনি সম্ভব হয়েছে বিদ্যুৎ যোগানো। সুবিধে হয়েছে সেচের।

—ঠিকই শুনেছেন। হীরাকুঁদ জলাধার থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। আর সে বিদ্যুৎ যাচ্ছে এ্যালুমিনিয়াম কারখানায় রুরকেল্লার ইস্পাত ও ফার্টিলাইজার কারখানায়। জোডার ফেরো ম্যাঙ্গানিজ প্লাণ্টে। রাজগাঙ্গপুরের সিমেণ্ট কারখানা, ব্রজরাজনগরের পেপার মিলে বিদ্যুৎ সরবরাহ হচ্ছে। চলে যাচ্ছে কোইরা, নোয়ামুণ্ডি বরগড়ে। অর্জুন বহিধর খোঁজ-খবর ভালোই রাখে। সমস্ত কিছু তার নখদর্পণে।

—জানেন বোধকরি এর নির্মাণকার্যে যে মাটি, কংক্রিট এবং মাল-মশল্লা খরচ হয়েছে তাতে অনায়াসে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত একটি দীর্ঘ রাস্তা বানানো সম্ভব হত। আট বছর ধরে পঁচিশ হাজার লোক নির্মাণে ব্যস্ত ছিল। যে জলাধারের সৃষ্টি হয়েছে তা নাকি এশিয়ার এর সবচেয়ে বৃহৎ কৃত্রিম হ্রদ। অর্জুন বহিধর শেষ করবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি অর্জুন বাহিধরকে চেপে ধরি। এবার আপনার পুরোনো গল্প বলুন।

—অতো অস্থির হলে চলে না মশাই। সব কিছুই শুনতে হয়। জানতে হয়। ওই মহানদীর জল খাঁড়ির ভেতর ঢুকেই তো সব অনাসৃষ্টি ঘটালে।

—তার অর্থ ?

—আরে মশাই। বিরাট বিরাট মাছ ওই জলে বাস করে।

—মাছের সঙ্গে মেয়েটির আত্মহত্যার কি সম্বন্ধ ?

প্রশ্ন করি আমি।

—ধীরে ধীরে সব বলছি। বিরাট বিরাট মাছ খাঁড়ির জলে কিলবিল কিলবিল করে। মাছগুলো মাঝে মাঝেই জল থেকে লাফিয়ে ওঠে। গোঁত্তা খেয়ে আবার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মন্দিরের সিঁড়ি নেমে গেছে জল পর্যন্ত। সর্বশেষ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মন্দিরের পুরোহিত আদর করে মাছদের ডাক দেয়। আর মাছেরা সেই ডাকে সাড়া দিয়ে পরম আনন্দে মুখ বাড়িয়ে তাদের হাত থেকে খাবার খায়। পুণ্যলোভাতুর তীর্থযাত্রীরা ঠিক ওভাবেই মাছদের আদর করে খাওয়ায়।

আমি বলি—আমি শ্রীলঙ্কার কাণ্ডিতে বুদ্ধদেবের টুথ টেম্পেলে ঠিক ওই ধরনের এক দৃশ্য দেখেছিলাম। মন্দিরের চাতালে সঞ্চিত জলের ভেতর অসংখ্য কচ্ছপের বাস। তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে খাবার মুখে তুলে নেবার জন্যে ওরা জল ছেড়ে সারিবদ্ধভাবে গুটি গুটি এগিয়ে আসে।

—জানেন মশাই। এ সব অঞ্চলে রেললাইন পাতবার আগে এই মহানদীর বুকের ওপর দিয়ে অতি সন্তর্পণে নৌকো চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হত। এখানকার সওদা জলপথে পাড়ি দিতো কটকের উদ্দেশ্যে। কালাপাহাড়ের নাম শুনেছেন বোধ করি। বলে অর্জুন বহিধর।

—নিশ্চয়ই শুনেছি। জবাব দিই।

—কিংবদন্তী প্রচলিত রয়েছে কালাপাহাড় যখন প্রবল বিক্রমে হিন্দুদের দেবদেবীর মূর্তি একের পর এক ভেঙ্গে সর্বনাশের সৃষ্টি করছে তখন পুরীর পণ্ডিতেরা আর পুরোহিতের দল জগন্নাথ দেবের মূর্তি নিয়ে এই মহানদীর বুকের ওপর দিয়ে নৌকো চালিয়ে পালিয়ে এসে সম্বলপুরের দক্ষিণে মহানদীর তীরে সোনেপুর নামক স্থানে জগন্নাথ দেবের মূর্তি মাটিতে পুঁতে রেখেছিলো।

—তার পর ?

—কালাপাহাড় জগন্নাথ দেবের মূর্তির খোঁজে ওদের পিছু ধাওয়া করে সৈন্যসামন্ত নিয়ে সম্বলপুর পর্যন্ত এসেছিল। প্রচলিত কাহিনী থেকে

জানা যায় সামলাই দেবী বালকের বেশ ধরে কালাপাহাড়ের সৈন্য সামন্তের কাছে দুধ এবং দই বেচেছিল। সেই দই আর দুধ খেয়ে সৈন্যদের যে কি হল। তারা রাতারাতি কালাপাহাড়ের আশ্রয় ছেড়ে পালাতে শুরু করলো। আর সেই সময় সুযোগ বুঝে রাজা বলভদ্র কালাপাহাড়ের সৈন্যদের ওপর হঠাৎ আক্রমণ করে তাদের পরাজিত করে বিতাড়িত করল। সামলাই দেবীর বিগ্রহ এ অঞ্চলে অনেক মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে মূর্তি সম্বলপুরেও রয়েছে। বরপলি আর সোনেপুরে।

—ইতিহাস অনেক হয়েছে। এবার যে মেয়েটি আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলো তার সম্বন্ধে কিছু বলুন।

—মেয়েটির নতুন বিয়ে হয়েছিলো। হুমাতে তার বাপের বাড়ি। স্বামীকে সঙ্গে করে প্রথমবার বাপের বাড়ি এসেছে। কতো স্ফূর্তি মনে। স্বামীর মনে কিন্তু সুখ নেই।

—কেন? প্রশ্ন করি।

—কয়েকদিনের মধ্যেই গ্রামবাসীরা স্বামীর কানে তুলে দিয়েছে যে মেয়েটির বিয়ের আগেকার প্রেমিক এ গ্রামে বাস করে। সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর মনে সন্দেহ দানা বেঁধেছে। এরপর যখন সে দেখতে পেলো তার স্ত্রী বেশ কয়েকদিনই সন্ধ্যের পর জল নিয়ে ঘরে ফিরছে তখন তো সন্দেহ বেড়েই চলবে। স্বামীর মনে সন্দেহ হল জল তোলবার ছুতো করে মেয়েটি বিকেলবেলা নদীর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। লোকে ভাবতো জল তুলতে যাচ্ছে কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল অন্য। তাই রহস্যের জাল ছিন্ন করবার জন্যে স্বামী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

—এর অর্থ দাঁড়ায় মেয়েটি পূর্ব প্রেমিকাকে ভুলতে পারে নি। মেয়েটি দেখতে কেমন ছিল?

—এ শহুরে সুন্দরী নয়। তবে গ্রামের মান হিসেবে একে সুন্দরী বলা চলে। গায়ের বর্ণ নিকষ কালো হলেও অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের লালিত্য আর সুষমা। এক সন্ধ্যেবেলা অরণ্যের ভেতর স্বামী লুকিয়েছিলো। মেয়েটি জল নিয়ে ফিরছিলো। স্বামী তাকে পাকড়াও করে কৈফিয়ৎ

দাবী করল।

—প্রেমিকের সন্ধান মিলেছিলো ?

—না। স্বামীর বিশ্বাস হল প্রেম খেলার পর প্রেমিক আগেভাগে সরে পড়েছে। স্বামী স্ত্রীর ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছিলো। আর সেই লজ্জা-ঘৃণা থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই মেয়েটি মহানদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। ডুবেই মরতো যদি না আমি সে সময় জলে ঝাঁপিয়ে পড়তাম।

—এরপরে কি হল ?

—আমি চেষ্টা-চরিত্র করে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মিলন ঘটিয়েছিলাম। আমি জানতে পেরেছিলাম মেয়েটি সম্পূর্ণ নির্দোষ।

—কি ভাবে মিলন ঘটলো ?

—আমি ওদের দু'জনকে মন্দিরের পুরোহিতের কাছে নিয়ে গেলাম।

—মন্দিরের পুরোহিতকে শেষ পর্যন্ত সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হল ?

—ঠিক তাই। বিয়ের আগে মন্দিরের কিছুটা দূরে নদীর জলে প্রকাণ্ড দুটো মাছ সাংঘাতিকভাবে মেয়েটির অনুরক্ত হয়ে পড়েছিল। মেয়েটি দিনের পর দিন ওদের হাতে করে খাইয়েছে। ওর চোখের সামনে মাছ দুটো বড়ো হয়েছে। এতো বড়ো হয়েছে যে না দেখলে বিশ্বাস করা অসম্ভব। মাছ দুটো পেয়েছে প্রচুর আদর। প্রচুর স্নেহ। তাই বিয়ের পরও মেয়েটির মনে শান্তি ছিল না। মাছ দুটোর কথা মনে হলে তার কষ্ট হতো। সে বিনিদ্র রজনী যাপন করতে শুরু করেছিল।

—অদ্ভুত এবং আশ্চর্য।

—তাই বিয়ের পর যখন সে প্রথম ঘুমাতে এলো তখন তার একমাত্র কাজ হল বিকেলের দিকে নদীকূলে হাজিরা দেওয়া। মাছ দুটোকে খাওয়ানো। মাছ দুটো ওর এতো অনুরক্ত হয়েছিলো যে ডাক দেওয়া মাত্র নির্বিবাদে জল ছেড়ে উঠে আসতো। উঠে আসতো খাবারের লোভে। মন্দিরের পুরোহিতের চোখ এড়ায় নি। সে স্বামীকে সব খুলে বলেছিল। স্বামী অবিশ্বাস করে নি। পুরোহিতের ওপর গ্রামবাসীর প্রত্যেকের ছিল অগাধ বিশ্বাস। তার কথা অমান্য করবার সাধ্য কারু ছিল না।

এর পর আমরা পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলাম। অর্জুন বহিধর তার ঘরে চলে গিয়েছিল। আমি আমার ঘরে।

গভীর রাত। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। বাংলোর পাশের বাগান থেকে মনুষ্য কণ্ঠধ্বনি কানে ভেসে আসাতে সচকিত হয়ে উঠে বসলাম। এতো রাতে কারা ফিসফিস করে কথা বলছে। কৌতূহলের দাস বনে গেছি ততোক্ষণে। ঘর ছেড়ে বারান্দায় চলে এলাম। হঠাৎ নজরে পড়লো বহিধরের ঘরের দরজা খোলা। সাহস করে ভেতরে উঁকি দিলাম। ঘর শূন্য। ঘরের ভেতর মোমবাতি জ্বলছে। বহিধর ঘরের ভেতর নেই। এতো রাতে সে কোথায় গেল ? সন্ধ্যে থেকে সে প্রচুর মদ্যপান করেছে। কোথায় সে যেতে পারে। এগিয়ে গেলাম বাগানের উদ্দেশ্যে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এক সময় বাগানে ঢুকে পড়েছি। বাগান নয়। ছোটো খাটো অরণ্য। সেখানে গাছ-গাছড়ার সমারোহ। এধার ওধারে ফুলের বেড়। একটা প্রকাণ্ড গাছের আড়ালে আত্মগোপন করেছি। অন্ধকার জমাট। হঠাৎ শুনি বহিধরের কণ্ঠস্বর। অর্জুন বহিধরের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে আরেক জনের কণ্ঠস্বর শুনে আমি চমকে উঠি। এ কণ্ঠস্বর আমার পূর্বে শোনা আছে। এ যে মঙ্গলীর কণ্ঠস্বর। কোথায় দেওগড়ের প্রাসাদ। আর কোথায় হুমার কাছে এ বাংলো। মনে মনে ভাবি মঙ্গলী এখানে এলো কি করে। অর্জুন বহিধরের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে—ভীমা ওঁরাওর—দেহটা কি করলি শেষ পর্যন্ত ? মঙ্গলী উত্তর দিলে—দেহটা শেয়াল কুকুরে-ছিঁড়ে খেয়েছে।—শেষ পর্যন্ত মরলো কি করে ?—মাছের ছোবলে মরেছে। -- ও তো নিজে থেকেই দেহে সাপের ছোবল নিচ্ছিলো। তবে ?—অর্জুনের কথা শেষ না হতেই মঙ্গলীর কণ্ঠস্বর।—এ সাপটার বিষ বড্ডো মারাত্মক। এ একটা বিশেষ সাপ গো। সচরাচর খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেক খুঁজে পেতে নিয়ে এসেছিলাম। আগেই খেয়েছে একটা ছোবল। সে বিষ সামলাতে তিন চারদিন লাগতো। আর এ সাপ ওকে কামড়ালে পর পর তিনবার। গল গল করে বিষ বেরুলো।

এর পর আফিং খেতে দিই নি। পারে কখনো ও বিষ সামলাতে। মরে কাঠ। মঙ্গলী খিলখিল করে হেসে ওঠে। সে হাসি ডাইনীর হাসি। পিশাচীর হাসি। ভয়ে আমার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। আমি শিউরে উঠি। দেওগড়ের প্রাসাদে ওই হাসি শুনে আমি এ রকম কেঁপে উঠেছিলাম।

—সাপটা খুবই তেজী আর সাংঘাতিক ওর বিষ। অনেক খুঁজে পেতে যোগাড় করেছিলাম। আমার সঙ্গে যখন রঙে রসে মেতে উঠেছিলো অন্ধকারে কালনাগিনীর মুখটা ওর জামার ভেতর ঢুকিয়ে বুকের মধ্যে চেপে ধরলাম। কালাকেউটের তিন ছোবল। জ্বলে-পুড়ে ও শেষ হল।

—হীরে পেয়েছিলি তুই ? অর্জুনের প্রশ্ন। মনে মনে ভাবি আবারও সেই হীরে

—না পাই নি। আমি পাই নি। ভীমা ওঁরাও মাটি খুঁড়ে পায় নি।

—ভীমা ওঁরাও পেলে না। তুই পেলি না। সে কি রকম কথা। অর্জুন বহিধর বিস্মিত।

—ভীমা পেলো না দেখে আমার ওপর শোধ নিলে।

—শোধ নিলে। বুঝতে পারলাম অর্জুন বহিধর শুধু বিস্মিত নয়। বিভ্রান্ত।

—ওর ভীষণ রাগ হল। প্রথমত ওকে আমি পুরোপুরি পুরুষ মানুষ বানিয়ে তুলতে পারি নি। তারপর লুকোনো হীরে ওর হাতছাড়া হয়েছে। ও রাগে জ্বলে উঠলো।

—কি করলে ও ? অর্জুনের প্রশ্ন।

—সেদিন অমাবস্যার রাত। তুই তো জানিস আমার সে রাতে পূজো দেওয়া চাই। আর তার জন্যে চাই একটি নধর কচি তুলতুলে শিশু। বাচ্চার রক্ত ছাড়া পূজো হয় না।

—বাচ্চার রক্ত পেয়েছিলি ?

—ওই ঘুটঘুটে আঁধারের ভেতর ভীমা একটা বাচ্চাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছে। বয়স হবে মাস তিনেক। বাচ্চাটাকে ততোক্ষণে আমি

গলা টিপে মেরে ওর গলায় দাঁত বসিয়ে রক্ত চুষে নিয়ে পাথরের ওপর ঢেলেছি। এরপর শুনতে পাই মঙ্গলীর কান্না। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আমার সারা অঙ্গ বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। আমি ঠক ঠক করে কাঁপছি। এতোটা আমি আশা করি নি।

—কাঁদছিস কেন মঙ্গলী? খুলে বল সব কিছু। মঙ্গলী তবুও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

—বল মঙ্গলী। সব খুলে বল। অর্জুন বহিধর ঘনঘন তখন তাগাদা দিতে থাকে।

—আলোতে মড়া বাচ্চার মুখ দেখতেই আমার মাথাটা ঘুরে যায়। মনে হল অজ্ঞান হয়ে যাবো।

—সে কি কথা।

—আমার বোনের ছেলেটাকে ভীমা শয়তান আমার হাতে তুলে দিয়েছিলো। অন্ধকারে ঠাওর করতে পারি নি। গলা টিপে নিজের বোনের ছেলেটাকে মারলাম। গলা ফুটো করে রক্ত বের করলাম। উফ্। ভীমাটা সাক্ষাৎ শয়তান। রাতের বেলা বোনের ঘরে ঢুকে বাচ্চাটাকে বের করে এনেছে। এনে জঙ্গলের ভেতর জমাট অন্ধকারে আমার হাতে তুলে দিয়েছে। উফ্। মঙ্গলী আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

—তুই কি করলি। বলে বহিধব।

—জানিস বোনের ছেলেটাকে আমি খুব ভালবাসতাম। কাছছাড়া করতামই না। একটু থেমে ফের মঙ্গলী শুরু করে—তাইতো বেছে বেছে কালনাগিনীটাকে নিয়ে আসলাম। তিন ছোবলেই ভীমা শেষ। শয়তানের ওরকমই হওয়া উচিত ছিল। মরবার সময় খালি বলছিল মঙ্গলী, জ্বলে গেল। পুড়ে গেল। তোকে আমি খুব ভালবাসতাম মঙ্গলী। তুই কেন আমার এ দশা করলি। তোকে একটা বাচ্চা দেবার আমার খুব সাধ ছিল। আবার সেই পিশাচিনীর ভয়ঙ্কর হাসি।

—তা মঙ্গলী হীরের কি হল? তুই হীরে পেলি নে? ভীমা ওঁরাও পেলে না। হীরে গেল কোথায়? বলে অর্জুন।

—ন্যাকামি করিস নে অর্জুন। হীরে তুই নিয়েছিস। তুই। মাটি খুঁড়ে তুই হীরে নিয়েছিস্। মঙ্গলীর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর।

আমি সত্যি সত্যি চমকে উঠি।

—আমি নিয়েছি। মিথ্যে কথা। প্রতিবাদ জানায় অর্জুন।

—তুই নিয়েছিস। তুই আমাকে ফাঁকি দিয়েছিস। ভীমা ওঁরাওকে ফাঁকি দিয়েছিস। এ কাজ তোর। ভীমা ওঁরাওকে পুরুষত্ব ফিরিয়ে দেবার নাম করে ওর দেহে তুই স্মুঁচ ফোঁটাতে শুরু করেছিলি। তুই আমার চেয়ে অনেক বেশী ধুরন্ধর। দেওগড়ের প্রাসাদে সে রাতে এক ভাঁড় মদ ওকে গিলিয়ে তুই ওর মনের সমস্ত কথা বের করে নিয়েছিলি। বল্। সত্যি কিনা। বল্। মঙ্গলী হাঁপাতে শুরু করে।

—সব মিথ্যে। সব মিথ্যে। অর্জুন প্রতিবাদের ঝড় তোলে। আমি হত-বাক, দূরে কি একটা হায়েনা ডাকলো। বাঘ আছে নাকি আশে-পাশে।

—মিথ্যে নয়। সব সত্যি, তুই হীরে চুরি করেছিস। তুই আমাদের দু'জনকে ফাঁকি দিয়েছিস। তুই ভীমাকে মাটি দেবার লোভ দেখিয়ে-ছিস। ঘর বানিয়ে দিবি বলেছিস, বাইজীর গান-বাজনা শুনিয়ে ওকে বশ করেছিস। সব তোর কাজ। তুই মর তাহলে এবার তোর মরণ। মঙ্গলী একটা শিশু বাঘিনী হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ অর্জুনের চীৎকার, জ্বলে গেল। পুড়ে গেল। জ্বলে গেল। মঙ্গলী এ তুই কি করলি। বড্ডো জ্বালা। অর্জুনের আর্তনাদ।

মঙ্গলীর সেই অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে-দেওয়া হাসি।—কালনাগিনীটা বড্ডো ভালো। বড্ডো বাধ্যক। আমার কথা বড্ডো শোনে।

মঙ্গলী উন্মাদিনীর মতো হাসতে শুরু করে।

আমি এক পা দু'পা করে পেছোতে শুরু করি।

এর পরে সংক্ষিপ্ত খবর।

মঙ্গলী পুলিশের কাছে ধরা পড়লো। অর্জুনের মৃতদেহ আমার বাংলোর ঘরের পাশ দিয়েই ওরা নিয়ে গেল।

তোষালি আর সমাপা ছিল সে সময়ে সমৃদ্ধশালী জনপদ। লোকেরা ছিল বীর্যশালী ও পরাক্রমশালী। মেগাস্থিনিসের হিসেব মতো কলিঙ্গ সৈন্যদলে ছিল ষাট হাজার পদাতিক। এক হাজার অশ্বারোহী। আর সাতশো হাতি। অশোকের শিলালিপিতে রয়েছে শিকারের বিবরণ। সেদিন হাতির সম্মান ছিল আকাশছোঁয়া। সামাজিক পূজাপার্বণে হাতির স্থান ছিল সর্বাগ্রে। কৌটিল্যের হিসেব মতে কলিঙ্গের হাতি ছিল সমধিক প্রসিদ্ধ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। দুই জনপদ তোষালি আর সমাপা জনপদের আশে-পাশের অরণ্যে ঘুরে বেড়াতো হস্তিযূথ আর হস্তির এ প্রাধান্যের জন্যে উড়িষ্যার প্রাচীরে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের ভেতর হাতির ছিল এক ঐতিহ্যপূর্ণ স্থান।

অশোকের শিলালিপিতে লেখা রয়েছে অন্যের ক্ষতি সাধন থেকে বিরত থাকো। কামকে জয় করো। নিরপেক্ষ হও। গম্ভীরতা থেকে নিজেকে মুক্ত করে হাসি মুখ ধারণ করো। অশোকের কলিঙ্গ জয়ের বেশ কিছু দিন পরের ঘটনা। ধৌলি প্রান্তরে সমবেত কতো নর-নারী।

সংখ্যা নির্ধারণ করা মুস্কিল। ন্যুব্জ দেহ, পলিত কেশ, অসংখ্য রেখা সমাচ্ছন্ন বৃদ্ধ। লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে অনেক দূরের পথ থেকে এসেছে। বৃদ্ধা ভালো করে চোখে দেখতে পারে না। সন্তানের হাত ধরে এসেছে। তরুণ-তরুণী হাসির হিল্লোল তুলেছে। অধিকাংশরই নগ্নপদ। কৃষক মুটে মজুর কামার কুমোর কতো শ্রেণীর লোকই না এসেছে। ধৌলি প্রান্তরে পুরুষ স্ত্রীলোক সমবেত হয়েছে।

রাজপুরুষ প্রেরিত দূতেরা ঢাক পেটাচ্ছে। তোষালি আর সমাপাতে অশোকের প্রেরিত মহান বার্তা থেকে রাজপুরুষেরা ক্ষণে ক্ষণে পাঠ করে শোনাচ্ছে। নতুন মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে ওদের। নতুন মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া হচ্ছে। পাঠ সমাপ্ত হলে সমবেত জনসাধারণের ভেতর কিছু লোককে নানা শুভকার্য সম্পন্ন করবার জন্যে পুরস্কৃত করা হবে। কেউ উপহার পাবে দ্রব্যসামগ্রী। কেউ ধনরত্ন। কেউ বা জমি। অনেক দাসকে চির-

দিনের জন্যে মুক্তি দেওয়া হবে। রাজ আজ্ঞা পাঠ করে শোনানো হচ্ছে। হিংসা নয়। মৃত্যু নয়। রক্তপাত নয়। ভীতি নয়। শুধু সাম্য-মৈত্রীর গান। প্রেম-ভালবাসার বাণী। শুধুমাত্র ধর্মের জয়। অধর্মের পরাজয়। প্রান্তরে তাঁবু পড়েছে অসংখ্য। তাঁবুর দ্বারে দ্বারে প্রহরারত প্রহরীগণ। অনবরত অশ্বের হ্রেষাধ্বনি। রাজপুরুষেরা জটলা পাকাচ্ছে ইতস্তত। রাজুকস্, প্রাদেশিকস্, যুক্তস্। বিভিন্ন শ্রেণীর পদ-মর্যদা সম্পন্ন রাজ-পুরুষেরা, রাজুকস্ শাস্তি আর পুরস্কার দেবার জন্যে দায়ী। চৌর্যবৃত্তির অপরাধে দণ্ডিত করবার জন্যে রয়েছে দণ্ডাদেশ।

চারদিকে পতাকা উড্ডীয়মান। নীল আকাশে উড়ছে শ্বেতপায়রার দল। একদিন ধৌলি প্রান্তরে ঝড় উঠেছিলো। আজ সেখানে শান্তি মৈত্রী প্রেম ভালবাসার বন্যা বয়ে যাচ্ছে। তরবারির ঝনঝনানি নয়। রণ-দামামা নয়। ধর্মবাণী পাঠ সমাপ্ত হয়েছে। সাম্য মৈত্রীর গীত গাওয়া শেষ হয়েছে। এবার রাজ অনুগ্রহ বিতরণের পালা। ঘোষক একের পর এক নাম ঘোষণায় ব্যস্ত। রাজ অনুগ্রহ প্রদানের পর শোনা হবে প্রতিটি ব্যক্তির নালিশ। তাদের অভাব-অভিযোগ। এর পর আমোদ আহ্লাদ। নৃত্য গীত। ভোজন পর্ব। উৎসবের পর নরনারীর রওনা দেব নিজ নিজ গৃহের উদ্দেশ্যে। অনেক দূরের পথ। রাজুকস্ রয়েছে যে বিচারের পর দণ্ড বিধান সাব্যস্ত করবে। অথবা গুণী ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করবে।

চৌর্যবৃত্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে দণ্ডাদেশ। এইমাত্র দু'জন তাদের অপরাধের জন্যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হল। বন্য হাতির আক্র-মণ থেকে এক বৃদ্ধাকে বাঁচাবার জন্যে পুরস্কৃত হল একজন। জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করবার জন্য পুরস্কৃত করা হল আরো একজনকে। উৎকোচ গ্রহণ করবার অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিলো আরো দু'জন। তাদের পদচ্যুতি ঘটলো'। রাজস্ব থেকে চুরি এবং অন্যায়ভাবে অপরাধীকে নির্যাতন করার দায়ে দু'জন অপরাধীকে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা হল। প্রতিটি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ছে। ঘন ঘন কর-তালিতে প্রান্তর মুখরিত।

জনতা চঞ্চল। উদ্বেল। কোলাহলমুখর। ছাগ অথবা মৃগচর্মের তৈরী তাঁবুতে প্রান্তর ছেয়ে গেছে। পাহাড়ের ওপর থেকে সমস্ত দৃশ্য বড্ডো মনোরম। প্রতিটি তাঁবুর পাশে অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় অশ্বারোহী সৈন্য পাহারারত অবস্থায় রয়েছে। তাদের মাথায় শিরস্ত্রাণ দেহবর্মাবৃত। পৃষ্ঠদেশে ধনুক। তূণে তীর। কুমার, মহামাত্য, রাজুকস্, যুক্তস্।
পতিভেচক, বাচভূমিক, লিপিকার। কতো ধরনের রাজপুরুষই না তোষালি আর সমাপা প্রান্তরে ভীড় জমিয়েছে। প্রান্তরে মেয়ে পুরুষ, যুবক যুবতী, প্রৌঢ় প্রৌঢ়ার ভীড়। জমি বিতরণ চলেছে। ছাগচর্মের ওপর লিপিবদ্ধ বাণীতে গুণীজনের গুণপনার বিবরণী পাঠ হচ্ছে। তূর্য নিনাদ হচ্ছে ঘনঘন। পণ্ডিত ব্যক্তিকে চন্দনে চর্চিত করে, সারা দেহে পুষ্প নির্যাস ছিটিয়ে, পুষ্পমালা কণ্ঠে পরিয়ে উত্তরীয় আর বস্ত্রখণ্ড দান করা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বিতরণ করা হচ্ছে মানপত্র। দামামা নিনাদের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে গুণীজনের নাম আর তার গুণাবলীর বিস্তৃত বিবরণ পাঠ করা হচ্ছে। দারিদ্র ক্লিষ্ট, রোগভারে জর্জরিত, বার্ধক্যের কশাঘাতে ম্লান মুখগুলো মাঝে মাঝেই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ফল মিষ্টিদ্রব্য পোষাক বিতরণ চলেছে। মৃৎপাত্রে ফল মিষ্টি বহন করে রাজপুরুষেরা জনতার ভেতর দিয়ে পথ করে চলেছে। পথ চলা দুষ্কর। মাঝে মাঝেই রাজপুরুষেরা জনতা দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ছে। লোকারণ্য ভেদ করে, জনতার প্রাচীর ডিঙিয়ে চলা প্রায় অসম্ভব। শীর্ণ দুর্বল হাতগুলোতে তারা ফল মিষ্টি তুলে দিচ্ছে। পোষাক-পরিচ্ছদ ইতস্তত ছুঁড়ে দিচ্ছে। বস্ত্রখণ্ড অধিকারের জন্যে চলেছে তীব্র সংঘর্ষ।
দান বিতরণের সময় বীতশোকের চোখ নিবদ্ধ হল এক কিশোরীর ওপর। এ সাধারণ নারী নয়। ছিন্ন তালি দেওয়া পোষাকের ভেতর থেকে রূপ যৌবন ঝলক দিচ্ছে। কে এই নারী? ফল মিষ্টির জন্যে হাত বাড়ায় নারী। পুরুষ ফল বাড়িয়ে ধরে। হাতে হাত ঠেকে। দু'জন দু'জনের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে। চঞ্চল মৃদু শীতল হাওয়া সারা অঙ্গে পরশ বুলায়। ধমনীর রক্তস্রোত চঞ্চল হয়। স্পর্শসুখে ক্ষণে

ক্ষণে শিহরিত হয় রাজপুরুষের দেহ।

রাজমহিষী কারুবাকির মুখের সঙ্গে এ মুখের যে অদ্ভুত মিল আর সাদৃশ্য। নৃপতি অশোকের অনেক পত্নীর এক পত্নী এই কারুবাকি। কলিঙ্গজয়ে এসে কলিঙ্গর বুক থেকে কারুবাকিকে নৃপতি অশোক তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। কলিঙ্গর রূপসী নর্তকী কারুবাকির তখন দেশজোড়া নাম। নৃপতি অশোকের কলিঙ্গ আক্রমণ করার অনেক-গুলো কারণ ছিল। তার একটি কারণ ওই নর্তকী কারুবাকি। ওকে অপহরণ করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। কলিঙ্গদেশের এ দুর্লভ রত্নকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলো নৃপতি অশোক। আর কলিঙ্গ নৃপতির মহিয়ষীরা তাতে এতোটুকু অসন্তুষ্ট হয় নি। বরং খুশীই হয়ে-ছিলো। আত্মপ্রসাদে ভরে উঠেছিলো তাদের হৃদয়। বীতশোকের কেমন যেন সব কিছু গোলমাল হয়ে যায়। কন্যার চিত্তবিভ্রম ততক্ষণে দূর হয়েছে। কন্যা সম্বিৎ ফিরে পেয়েছে। কিশোরী বৃদ্ধাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে চলেছে। উদ্দেশ্য ফিরে যাওয়া। ভীড়ের ভেতর পথ করে কিশোরী বৃদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। রাজপুরুষের কামপ্রবণতা সে মনে মনে উপলব্ধি করেছে। সে ভীত, চকিত দৃষ্টি ফেলে যথাসম্ভব দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। সে এও জানে রাজকোষ থেকে রক্ষা পাওয়া দুষ্কর। পলায়নরত নারী নিজ গৃহে ফিরে যাবার জন্যে উন্মুখ ব্যগ্র। ভীড়ের ভেতর দিয়ে পথ করে দ্রুত এগুনো অসম্ভব। তাই সে সোজাপথে না গিয়ে খানিকটা ঘুরে মেঠোপথ ধরলো।

রাজপুরুষের অশান্ত মন। কাজ কর্মে অনাসক্তি। তার দুই চোখ জন-তার ভেতর কাকে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। এদিকে ফল মিষ্টি পোষাকের জন্যে জনতা উদগ্রীব। অস্থির, চঞ্চল, অশান্ত। একটুকরো পোষাকের জন্যে কাড়াকাড়ি চলেছে। জীর্ণ শীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের আড়ালে পূর্ণিমার চাঁদ হাসছে। বীতশোকের চিত্তচাঞ্চল্য দূর হয় না। এ কি দেখলো সে। কাকে দেখলো সে?

এতো রূপ। এতো যৌবন। অশোকের রাজমহিষী কারুবাকির সঙ্গে এ

চেহারার এতো মিল। এতো সাদৃশ্য। কিশোরী ভীত। মেঠোপথ ধরে হন হন করে এগিয়ে যেতে চেয়েছিলো। কিন্তু তা সম্ভব নয়। সঙ্গে বৃদ্ধা রয়েছে। তার গতি শ্লথ। মন্থর। কিশোরীর কর্ণমূল আরক্ত। কপোলে রক্তিম আভা। অজানা অচেনা পুরুষ তার হাত চেপে ধরেছিলো। এ চিত্তচাঞ্চল্য এর আগে সে কখনো অনুভব করে নি। মাঝে মাঝে সে ঘুরে দেখছিলো। কাকে খুঁজছিলো কে জানে। বীতশোকের পক্ষে অন্য-কার্যে মনোনিবেশ করা অসম্ভব। সে কর্তব্য কর্ম ফেলে রেখে জনারণ্য থেকে দ্রুতপদে একদিকে চলে আসে। উঠে যায় এক টিলার ওপর। সেখান থেকে দূরবীনদৃষ্টি চালায় সমস্ত প্রান্তরের ওপর। মুহূর্তে তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। দূরে বহু দূরে প্রান্তর যেখানে অরণ্যের সঙ্গে মিশে ঠিক সেই সঙ্গমস্থলের কাছে তুটি মনুষ্য। বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে একটি দেহ আর তার হাত ধরে এগিয়ে চলেছে একটি কিশোরী। বহুদূরে। প্রায় তুটি বিন্দুর মতো। তবুও রাজপুরুষের দৃষ্টিকে ওরা ফাঁকি দিতে পারে না। খানিকক্ষণের ভেতরই মনুষ্যমূর্তি তুটো অরণ্যের ভেতর প্রবেশ করবে। টিলার ওপর থেকে রাজপুরুষ নেমে আসে। চলে যায় যেখানে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় অশ্ব দাঁড়িয়ে রয়েছে। অল্পক্ষণের ভেতরই রজ্জুমুক্ত হয় অশ্ব এবং তার পরে অশ্বপৃষ্ঠে লাফিয়ে উঠে বীতশোক ঘোড়া ছোটায়। ধুলোর ঝড় ওঠে। বীতশোক জানতো না যে অন্যান্য অনেক রাজপুরুষেরই দৃষ্টি এতোক্ষণ তার ওপর নিবদ্ধ ছিল। কর্তব্য কর্মে অবহেলার পরমুহূর্ত থেকেই তাদের দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করেছে। রাজকর্মে অবহেলা। এক দণ্ডনীয় অপরাধ। এক কিশোরীর প্রতি আসক্তি তাদের নজর এড়ায়নি। অন্য তুই রাজ পুরুষের সঙ্গে প্রহরীরা ততোক্ষণে ঘোড়া ছোটায়। অনুসরণ করে বীতশোককে। অশ্ব দ্রুত ধাব-মান। অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় বীতশোক। উদ্দেশ্য কিশোরীর কাছে পৌঁছুনো। বীতশোকের মনে একটাই প্রশ্ন। এ কিশোরী কে?

নর্তকীশ্রেষ্ঠা কারুবাকি অসামান্য রূপযৌবনের অধিকারিণী যাকে অশোক অপহরণ করেছিলেন। সে নারী কি কলিঙ্গ পরিত্যাগের পূর্বে

কলিঙ্গের মাটিতে তার কন্যাকে রেখে দিয়েছিলো ? সে কন্যাই কি এ কিশোরী। কে এ প্রশ্নের জবাব দেবে। অশোকের রাজপ্রাসাদে বীত-শোকের ছিল অবাধ গতি। আর কারুবাকিকে সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে। আজ দেখলো সে এই কিশোরীকে। তার ভুল হবার কথা নয়। ঝড়ের গতিতে সে অশ্ব ছোটায়। ধুলোর ঝড় তুলে বীতশোকের অশ্ব কন্যা আর বৃদ্ধার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। কন্যা ভয়ে কাঁপছে। সে অনেকক্ষণ আগেই অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনেছিলো। একলা হলে সে অরণ্যেব ভেতর ছুটে পালাতো ! চেষ্টা করতো নিজেকে বাঁচাবার। কিন্তু বৃদ্ধাকে নিয়ে তা সম্ভব নয়। বাধ্য হয়ে সে নিয়তির হাতে নিজেকে সমর্পণ করেছে। বীতশোক তার গন্তব্যস্থলে প্রায় পোঁছে গেছে। সে অশ্বের বল্গা সংযত করে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে। এগিয়ে যায় কন্যার প্রতি। কিন্তু মাত্র কয়েক পা সে এগিয়েছিলো। একটি বিষাক্ত তীর কোথা থেকে উড়ে এসে তার দেহের পশ্চাৎ ভাগে আমূল বিদ্ধ হয়। একটা তীব্র চিৎকার করে সে ভূমিতে গড়িয়ে পড়ে। ফিনকি দিয়ে রক্তের ফোয়ারা নির্গত হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে সমস্ত শরীরটা বিষে নীল হয়ে যায়। কম্পিত হাত দুটো খানিকটা জলের জন্যে চারদিকের জমি হাতড়িয়ে বেড়ায়। মুঠি মুঠি দূর্বা আগাছা উৎপাটিত হতে থাকে। ধীরে ধীরে প্রাণপাখী দেহ ছেড়ে বেরিয়ে যায়। রাজপুরুষেরা অরণ্যের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। তারা অন্য পথ ধরে রওনা দিয়ে খানিকটা আগেই অরণ্যের ভেতর প্রবেশ করেছিলো। অশ্ব থেকে নেমে তারা এই মুহূর্তটুকুর জন্যে অপেক্ষা করছিলো। কন্যার সতীত্ব ধূলিস্যাৎ করবার আগেই তারা উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছে। কাপুরুষ, কামপ্রবণ পশুটা মরে কাঠ হয়ে আছে।

রাজা অশোকের সাম্রাজ্যে সতীত্বের অবমাননা তারা হতে দেবে না। এ বিষয়ে রাজা অশোকের কঠিন নির্মম আদেশ রয়েছে। সে আদেশই তারা পালন করেছে। এক রাজপুরুষ বৃদ্ধা ও কিশোরীকে বলে —মা। ভগ্নী তোমরা নিরাপদ। কুণ্ঠাহীন চিত্তে গৃহে গমন করো। বীতশোকের দেহটা মাটিতে পড়ে থাকে।

৭

বাঘিনী ছুটেছে বিদ্যুৎগতিতে অরণ্যপথ ধরে। পেছন পেছন ঘোড়া ছোটাচ্ছে কারুবাকি। পাশে অশ্বপৃষ্ঠে দীপসিংহ। কলিঙ্গ সেনাপতি। দুর্লভ সুন্দর ভয়ঙ্কর প্রাণীর প্রতি লোভ পড়েছে কারুবাকির। মাইলের পর মাইল অনায়াসে পার হচ্ছে কারুবাকি। সঙ্গে দীপসিংহ। অজানা অচেনা অরণ্য। চারদিকে বন্য বৃক্ষের সমারোহ। দূরে দূরে পাহাড়ের সারি। নয়ন মনোহর প্রকৃতির শোভার অঢেল সম্ভার। মাথার ওপর সাদা পেঁজা মেঘের রাশি। টিয়া নীলকণ্ঠ পাপিয়ার ঝাঁক ক্ষণে ক্ষণে উড়ে যাচ্ছে। কারুবাকির সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিচ্ছে দীপসিংহ। প্রেমের অভিনয়ে দক্ষ সেনাপতি দীপসিংহ অরণ্যপথে প্রেমের খেলা খেলতে খেলতে কারুবাকিকে এনে ফেলেছে সম্পূর্ণ অজানা অচেনা জনমানবহীন এক অরণ্যের ভেতর। দীপসিংহ কারুবাকিকে প্রথমে দিয়েছিলো মৃগয়ার আশ্বাস। ওই প্রলোভনেই এতো দূরের পথ কারু-বাকি পার হয়ে এসেছিলো। দীপসিংহের নির্দেশেই বনরক্ষীরা এক ভীষণদর্শন ব্যাঘ্রকে নানাপ্রকার শব্দজালের সৃষ্টি করে সচকিত ভীত করে বনস্থলের অভ্যন্তর থেকে এনে ফেলেছিলো কারুবাকির দৃষ্টি-সীমানার ভেতর। আর তাই কারুবাকি হয়ে উঠেছিলো চঞ্চল, অস্থির। ব্যাঘ্র শিকারের নেশায় মেতে উঠেছিলো। মনুষ্য শিকার সে তার এ জীবনে অনেক করেছে। ব্যাঘ্র শিকার তার এই প্রথম। তাই কোনো কিছুর দিকে ফিরে তাকাবার সময় তার ছিল না। দীপসিংহ প্রতিজ্ঞা করেছিলো ব্যাঘ্রের প্রতি প্রথমে সে তার তীর নিক্ষেপ করবেনা। সব কয়টি তীর ছুঁড়বে কারুবাকি। অবশ্য ব্যাঘ্র যদি আহত হয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। ছুটে আসে কারুবাকির প্রতি। তবে অবশ্য অন্য কথা। কারু-

বাকির প্রাণ সংশয় হলে তবেই দীপসিংহের ধনুর্বান সক্রিয় হবে। জ্যা মুক্ত তীর ছুটে গিয়ে ব্যাঘ্রের ভবলীলা সাঙ্গ করবে। আনন্দে নেচে উঠে-ছিলো কারুবাকির অন্তর। অশ্বের গতি সংযত করে কিছুক্ষণের জন্যে নেমে পড়েছিলো কারুবাকি। সঙ্গে সঙ্গে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করে-ছিলো দীপসিংহ। কলিঙ্গের সবচেয়ে সুন্দরী নর্তকী চুমোয় চুমোয় আচ্ছন্ন করেছিলো দীপসিংহের মুখমণ্ডল। কারুবাকি ছিল প্রেম অভিসারে নিপুণা। অতিশয় চতুরা। অসম্ভব প্রতিপত্তিশালিনী। কলিঙ্গের যুব-রাজ ছিল যার হাতের মুঠোয়। সেনাপতি দীপসিংহ এই মুহূর্তে যার প্রসাদ লাভে ধন্য। নগরের বিত্তশালী সম্ভ্রান্ত গণ্যমান্যদের অনেকেই কারুবাকির সঙ্গ পাবার জন্যে ছিল আকুল, অস্থির।

কলিঙ্গ রাজপ্রাসাদে রাজমহিষীর চোখে নিদ্রা নেই। প্রহরের পর প্রহর পার হয়ে যাচ্ছে। রাত্রি গভীর থেকে গভীরতর। তবু যুবরাজের দেখা নেই। অধীর আগ্রহে সময় গুণছে রাজমহিষী। রাজকুমারের জন্যে প্রতি রাতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রাজমহিষী। প্রহরের পর প্রহর অতিক্রান্ত হয়। যুবরাজের দেখা মেলে না। রাতের শেষ প্রহরে রাজ-কুমার যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করে তখন সুরার আধিক্যে সে টলছে। কারুবাকির গৃহে সারারাত নৃত্য গীত চলেছে। সঙ্গে চলেছে সুরাপান। কারুবাকির সঙ্গে অন্যান্য সুন্দরীদের নুপূর নিক্কণের শব্দে যুবরাজ ভুলে গেছে গৃহে প্রত্যাবর্তনের কথা। রাণীকে সমস্ত খবর এনে দেয় রাজ-প্রাসাদের গুপ্তচর। কারুবাকি প্রতি রাতে স্বল্প বস্ত্রে নিজেকে আচ্ছাদিত করে নৃত্যপটিয়সীর ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়ে নৃত্যগীতে এক স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি করে। পানপাত্র থেকে ঘন ঘন সুরা ঢেলে নিজে পান করে। পান করায় যুবরাজকে। মাঝে মাঝেই কারুবাকির বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ে রাজকুমার। সমস্ত অবগত হয়ে জ্বলে ওঠে রাজমহিষী। অসম্ভব এ জ্বালা। যে করে হোক রাজকুমারকে এ পিশাচীর কবল থেকে মুক্ত করতে হবে। শপথ নিয়েছে রাজমহিষী। রাজকুমার এ নররাক্ষসীর প্রেমে অন্ধ। যুবরাজ নিজ মহিষীকে ভুলেছে। সে ভুলেছে রাজকার্য।

নগরের অনেকেই কারুবাকির রূপে অন্ধ। শুধু একজন এখনো পিশাচীর কবলে আত্মসমর্পণ করে নি। কারুবাকি যাকে এখনো নাগপাশে জড়াতে পারে নি। একমাত্র ব্যক্তি। সে হলো দীপসিংহ। রাজ্যের সেনাপতি।

রাজমহিষী গুপ্তচর মারফত খবর পেয়েছে দীপসিংহ রাজপ্রাসাদের চতুর্দিকে চক্রান্তের জাল ছড়াচ্ছে। শুধু রাজপ্রাসাদে কেন? সমস্ত নগরে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ছে। রাজমহিষী গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করে এতোদিন শঙ্কিত ছিল। নানা আশঙ্কায় তার হৃদয় ভারাক্রান্ত ছিল। রাজকার্যে উদাসীন যুবরাজের কানে কথাটা তুলে কোনো লাভ হয় নি। ভ্রূক্ষেপ নেই রাজকুমারের। কারুবাকি তার ধ্যান-জ্ঞান। এ সুবর্ণ সুযোগ দীপসিংহ হেলায় হারায় নি। অসংখ্য আঁখিকে ফাঁকি দিলেও দীপসিংহ রাজমহিষীর চোখকে ফাঁকি দিতে পারে নি। রাজমহিষী প্রথমে চঞ্চল হয়ে উঠেছিলো। প্রথমে রাজমহিষী ভেবেছিলো চক্রান্তের এ জালকে ছিন্নভিন্ন করে দেবে। কিন্তু এখন সে অন্যপ্রকার ভাবছে। রাজমহিষীর সমস্ত চেষ্টা, কৌশল মিথ্যে হবে। যার জন্যে সে সবকিছু করতে প্রস্তুত সেই যুবরাজ সম্পূর্ণভাবে কারুবাকির হাতের মুঠোয়। কে বলতে পারে রাজকুমার কারুবাকিকে শেষ পর্যন্ত সিংহাসনে বসাবে কিনা। রাজমহিষীর শেষ পর্যন্ত হয়তো প্রাসাদেই ঠাঁই মিলবে না। রাজমহিষী চিন্তা করে কূল পায় না। সারারাত সে চোখের পাতা বুজতে পারে নি। যেদিন থেকে রাজকুমার কারুবাকির প্রেমে অন্ধ সেদিন থেকে রাজ্যে শান্তি নেই।

প্রথমে বিস্তীর্ণ এলাকা খরাতে জ্বলে-পুড়ে খাক হয়েছে। একমুঠো অন্নের জন্যে ঘরে ঘরে হাহাকার উঠেছে। তারপর হঠাৎ কি কারণে কে জানে প্রাসাদের এক অংশ আগুনে পুড়ে ছারখার। জতুগৃহ দাহ হয়েছে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছে। চতুর্দিকে সাপের ফণার মতো লেলিহান অগ্নিশিখা। ঘন ধোঁয়ার কুণ্ডলী।

তারপর এলো বন্যা। বহু বিস্তীর্ণ প্রান্তর বন্যার জলে প্লাবিত হয়েছে। চতুর্দিকে পথঘাট ভেসে গেছে। ক্ষেতে শস্যের সমারোহ দুর্ভাগ্যের কবলে

পড়েপচতে শুরু করেছে। চাষীর কুটির গোলা মহিষ সব ভেসে গেছে। খড়ের ছাউনী, মাটির বাঁশ কঞ্চির ঠাট-বাট দিয়ে তৈরী দেয়াল চার-পাঁচ হাত উঁচু মাটির ঘেরানের ওপর তালপাতার আবরণ বন্যাজলের তোড়ে ভেসে গেছে। কেন এসব অনাসৃষ্টি কাণ্ড? সমস্ত রাজ্য জুড়ে কেন এ হাহাকার? কেন অসহায় লোকের ক্রন্দনরোল? এ সবের কারণ ঐ কারুবাকি। সে একটা রাক্ষুসী। পিশাচী। রাজপুরোহিত এ রকমই মন্তব্য করেছে। সুতরাং সবাইকে বাঁচাতে হলে, রাজকুমারকে বাঁচাতে হলে কারুবাকিকে ধ্বংস করতে হবে। দরকার হলে তাকে হত্যা করতে হবে। আর সেজন্যে দরকার দীপসিংহকে। ঐ একটি লোক যে এ কাজের উপযুক্ত। যে চক্রান্তের জাল ধীরে ধীরে ছড়াচ্ছে। যার ক্ষমতা আছে। শক্তি আছে। আর বোধ করি সেজন্যেই আজ গভীর রাতে রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরের দ্বার ছিল খোলা। বিছানায় অপেক্ষা করছে রাজমহিষী। বিছানায় পুরুষ ও নারী ঘন নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে সমস্ত চক্রান্ত পাকা করে তুলবে। দীপসিংহ কথা দিয়েছিলো কারু-বাকিকে হত্যা করবার জন্যে তাকে সে ভুলিয়ে গভীর অরণ্যের ভেতর নিয়ে যাবে। জনমানবহীন অরণ্যের ভেতর হত্যা করবে কারুবাকিকে। তার দেহটা সেখানে ফেলে রেখে অশ্ব ছুটিয়ে চলে আসবে। রাজ-মহিষীকে বাঁচাবে কারুবাকির হাত থেকে। রাজমহিষী অবশ্যই সাহায্য করবে দীপসিংহকে। ব্যাঘ্রশিকারের প্রলোভন দেখিয়ে দীপসিংহ কারু-বাকিকে অরণ্যের গভীরতম প্রদেশে নিয়ে এসেছিলো। কপট প্রেমের খেলা খেলছিলো দীপসিংহ। কিন্তু দীপসিংহ সম্ভবত জানতো না যে-কেউ কারুবাকির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে একবার এসেছে—সে ভুলেছে সবকিছু। কারুবাকির রূপ, যৌবন, চাল-চলন, কথাবার্তা হাবভাব পুরুষের মনে যে মায়াজাল রচনা করে তার প্রভাব থেকে আত্মরক্ষা অসম্ভব। তার রূপশিখায় মনুষ্যরূপী পতঙ্গেরা অনায়াসে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুড়ে মরে। কারুবাকি মাত্র কয়েক ঘণ্টা দীপসিংহকে সঙ্গ দান করেছে। দীপসিংহ ইতিমধ্যে কেমন যেন মোহাচ্ছন্ন। কিছুতেই যেন নিজেকে সংযত করতে

পারছে না। কারুবাকির চুম্বনে সুরার চেয়ে বেশী ঝাঁঝ। আর সে ঝাঁঝ দীপসিংহের মাথায় উঠেছে। রাজমহিষীর সঙ্গে কথোপকথন, প্রতিজ্ঞা, শপথ সমস্ত কিছুই ঝাপসা হয়ে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। মৃগচর্ম নির্মিত পাত্র থেকে সুরা ঢেলে দু'জনে পান করেছে। দীপসিংহ চতুর পুরুষ। গভীর চক্রান্তে সে লিপ্ত। সমস্ত রাজ্যে ধীরে ধীরে সে চক্রান্তের জাল ছড়াচ্ছে। তার আশার সীমা পরিসীমা নেই। রাজসিংহাসন তার লক্ষ্য। নর্তকীকে নিয়ে আমোদ-আহ্লাদে মেতে থাকা তার উদ্দেশ্য নয়। এ সমস্ত আয়োজন শুধুমাত্র রাজমহিষীকে সন্তুষ্ট রাখবার জন্যে। সে রাজমহিষীকে কথা দিয়েছে গভীর অরণ্যে কারুবাকিকে হত্যা করবে। কিন্তু একি হল তার? কারুবাকি ক্রমশঃ মায়াজাল ছড়াচ্ছে। ধীরে ধীরে দীপসিংহের কারুবাকির প্রতি আসক্তি বেড়ে যাচ্ছে। তবে কি সে কারুবাকির প্রেমে পড়লো? না। না। তা সম্ভব নয়। কি রূপ কারুবাকির। চোখ জুড়িয়ে যায়। কি কথা কারুবাকির। মন ভরিয়ে তোলে। মাঝে মাঝে দীপ-সিংহের ইচ্ছে হচ্ছে রাজসিংহাসন নয়। ধন, মান ঐশ্বর্য নয়। কারু-বাকিকে নিয়ে এক সাধারণ কুটিরে সারাটা জীবন কাটিয়ে দেবার ইচ্ছে প্রবল হচ্ছে। কিন্তু পরক্ষণেই দীপসিংহের অন্তরে কে যেন বলে উঠছে—না না। এ তোমার শোভা পায় না দীপসিংহ। একটি সাধারণ নর্তকীর জন্যে কেন তুমি শুধু শুধু সমস্ত কিছু বিসর্জন দেবে। তোমার পথ সুনির্দিষ্ট। সম্রাটের আসনে তুমি বসবে। প্রজাদের শাসন করবে তুমি। তাদের শ্রদ্ধা পাবে তুমি। দেশজোড়া খ্যাতি হবে তোমার। ইতিহাসের পাতায় তোমার নাম থাকবে। তুমি কেন এক-জন সামান্য নর্তকীর জন্যে নিজের মান-সম্মান প্রতিপত্তি নষ্ট করবে। পরক্ষণেই দীপসিংহ নিজেকে সংযত করে। তবে এটা ঠিক দীপসিংহ কারুবাকিকে হত্যা করতে পারবে না। না কখনোই নয়। স্বহস্তে তাকে হত্যা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কি করা যায়। দীপসিংহ চিন্তা করতে থাকে। হ্যাঁ। তার মনে কে যেন বলে ওঠে—তোমার কাছে ঘুমের ওষুধ রয়েছে। সুরার সঙ্গে ওষুধ মিশিয়ে দাও। ওই সুরা পান করে

ধীরে ধীরে কারুবাকি ঘুমের কোলে ঢলে পড়বে। ওই অবস্থায় তাকে অরণ্যের ভেতর ফেলে রেখে তুমি ফিরে যাও। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। খানিকক্ষণের ভেতর রক্তলোলুপ পশুরা খাদ্যের লোভে বনের অভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে আসবে। তারা কারুবাকির ঘুমন্ত দেহটা চিবিয়ে খাবে। তুমি কেন ঘাবড়াচ্ছো দীপসিংহ। রাজসিংহাসন তোমাকে হাতছানি দিচ্ছে।

ব্যাঘ্রকে অনুসরণ করা আর সম্ভব হয় নি। গভীর অরণ্যের ভেতর প্রেম-খেলায় মেতে উঠেছে দু'জন। দীপসিংহ আর কারুবাকি। দু'জনের প্রেমই কপট, কৃত্রিম, মেকী। দীপসিংহ প্রেমের অভিনয় করছে। কারুবাকি জেনেছে রাজ্যে দীপসিংহ চক্রান্তের জাল বিস্তার করছে। তার প্রভাব-প্রতিপত্তি দিন দিন বাড়ছে। দীপসিংহকে এখন হাতে রাখতে হবে বৈকি। কারুবাকি দীপসিংহকে ভালবাসতে পারে নি। কিন্তু কপট প্রেমের অভিনয় করতে দোষটা কোথায়।

বনপথে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে।

প্রেমখেলার মাঝে মাঝে দু'জনে ঘন ঘন সুরাপান করছে। দীপসিংহ এক সময় অতি সাবধানে সুরার সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিলে। আর সেই সুরা পান করে কারুবাকি ক্রমশ যেন ক্লান্ত অবসন্ন বোধ করছে। ধীরে ধীরে তার দেহ নিস্তেজ হয়ে আসছে। কারুবাকি কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ছে। এক সময় এক বিরাট বৃক্ষের নিচে কারুবাকি গভীর ঘুমে ঢলে পড়ে। আর তাকে সেখানে ফেলে রেখে দীপসিংহ চলে যায়। সে চোরের মতোই পালিয়ে যায়। শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে ঘনায়মান অন্ধ-কারের ভেতর কারুবাকির নিশ্চল দেহটা পড়ে থাকে।

মৃগয়া করতে বেরিয়েছিলো নৃপতি অশোক। সারাদিন শিকারে ব্যাপৃত থাকাকালীন অশোক অরণ্যপথে পথ হারিয়েছিলো। শিকারের আশায় ঢুকে পড়েছিলো এ গভীর অরণ্যে। তার পর এক সময় সে পথ হারিয়েছে। অরণ্য গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে।

নিজ রাজ্যসীমা সে পার হয়ে এসেছিলো। কখন যে ঢুকে পড়েছিলো

অন্য রাজ্যের ভেতর তা সে নিজেও টের পায় নি। প্রাণপণে সম্রাট অশোক অশ্ব ছুটিয়েছে। নৃপতি অশোক। কিন্তু পথের সন্ধান মেলে নি। সন্ধ্যার পূর্বে নৃপতি অশোক এমন একটি স্থানে উপস্থিত হয়েছিলো যেখানে অঘোরে ঘুমিয়েছিলো কারুবাকি। অসামান্য রূপবতী নারীকে ওইখানে ওই অবস্থায় ঘুমন্ত দেখে অশোকের বিস্ময়ের অন্ত ছিল না। সে অশ্ব থামিয়ে অশ্ব থেকে অবতরণ করেছিলো। অবতরণ করে নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়েছিলো। অতি যত্নের সঙ্গে এবং সন্তর্পণে যুবতীকে অশ্বের ওপর তুলেছিলো। তারপর এক সময় তীব্রগতিতে অশ্ব ছুটিয়েছিলো। এর পরের ঘটনা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায় কারুবাকি অশোকের মহিয়ষীদের ভেতর একজন ছিল। কিংবদন্তী থেকে জানা যায় অশোকের কলিঙ্গ অভিযানের এক প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কারুবাকিকে কলিঙ্গ থেকে নিজ দেশে নিয়ে যাওয়া। অশোক আর কারুবাকির প্রেম উপাখ্যান নাকি এখনো পুরী জেলার ধীবর সম্প্রদায়ের মুখে মুখে ফেরে।

## ৮

কয়েক দিন আগে এ স্থানটি লোকজনে ছিল সরগরম। আজ নির্জন, লোকজনশূন্য, পরিত্যক্ত, নিস্তব্ধ। নদীর পাড়ের ওপর এসে দাঁড়ালেই চোখ ছুটো এক লাফে ওপারে চলে যায়। ব্রাহ্মমুহূর্ত পার হতে না হতে ভারতের নানা খ্যাত অখ্যাত স্থান থেকে এসে তীর্থযাত্রী এখানে জড়ো হয়। পুণ্যতোয়া নদীর ঘাটে হাজার হাজার নরনারী অবগাহন করে।

সুন্দরগড় জেলায় রুরকেল্লা থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরে শঙ্খ এবং কোয়েল নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এই বেদব্যাস। শঙ্খ এবং কোয়েল নদী যেখানে মিলিত হয়ে ব্রাহ্মণী নদীর সৃষ্টি করেছে।

পরাশর মুনি নিকটবর্তী পরাশর গুড়ি থেকে নদী পার হবার সময় ধীবরকন্যা মৎস্যগন্ধার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিলো। মৎস্যগন্ধা ছিল স্থানীয় ধীবর-প্রধানের কন্যা। নৌকোতে পার হচ্ছিল পরাশর। নৌকোর ভেতর ছু'জনের আলাপ, সেখানে প্রেম, সেখানে বিবাহ। মধ্য নদীতে গর্ভবতী হল মৎস্যগন্ধা। ধীবরকন্যা ব্রাহ্মণ্য ধর্মে উন্নীত হয়ে হল ব্রাহ্মণী। নদী পরিচিত হল ব্রাহ্মণী নদী বলে। ঝুরঝুরে বালিতে পা ছুটো পুঁতে গিয়েছিলো। অনেকখানি বালি ভেঙ্গে নদীতে পৌঁছুতে হয়। স্তবগান চলেছে। ডালি নিয়ে কেউ পুজো দিচ্ছে। কেউ কেউ বারবার স্নান করছে। যতো স্নান ততো পুণ্য।

মৎস্যগন্ধার গর্ভে জন্ম হল ব্যাসদেবের। নিকটবর্তী পাহাড়ের গুহায় বসে সে নাকি মহাভারত রচনা করেছিলো। এ নদীতে স্নান করলে নাকি প্রচুর পুণ্য হয়। তাই তো শিবরাত্রি এখানে খুব জাঁক জমকের সঙ্গে প্রতিপালিত হয়। তাই চলেছে পূজাপাঠ ও কীর্তন। এইনদীতে

স্নান করলে অপুত্রক মহিলারা সন্তানবতী হন বলে অনেকের বিশ্বাস। ফাল্গুন মাস। বালি তেতে উঠেছে। গনগনে আগুনের মতো। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দু'শো উনিশ মিটার উঁচুতে অবস্থিত বেদব্যাস প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্যে বিখ্যাত। পথে যেতে পড়ে গুরুকুল বৈদিক আশ্রম। এখানে সংস্কৃত মাধ্যমে পড়াশুনো হয়।

কতো রকম লোকই তো এসেছে। গাঁজায় দম দেওয়া সন্ন্যাসী। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণচৈতন্য সমিতির সদস্য। ভারত সেবাশ্রম সংস্থার পক্ষ থেকে লোক এসেছে। সাধুরা ডুব দিচ্ছে। বালি মাখছে সারা অঙ্গে। আবার ডুব দিচ্ছে। চলছে গীতা পাঠ। চণ্ডী পাঠ। বেদ ও শাস্ত্রাদি পাঠ চলছে। ভজন কীর্তন পূজারতি ও ধর্মীয় প্রবচন ও হোমযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

কিছু দূরে শাল জঙ্গল শুরু হয়েছে। শুকনো পাতার ওপর দিয়ে শব্দ তুলে সৌরভ হাঁটতে শুরু করলো। শীতকাল ফুরোতে না ফুরোতে জঙ্গলের গাছগুলো পুরনো পাতা খুলে ফেলে নতুন পাতা পরে নিয়েছে।

সৌরভ নিকটবর্তী গুরুকুল বৈদিক আশ্রমের ছাত্র, ওখানে থেকে পড়াশুনো করে। সৌরভ হাঁটছে আর হাঁটছে।

এদিকে অরণ্যের ভেতর দুটো পশু হিংস্র হয়ে উঠেছে। নির্জন অরণ্যে ওদের চোখগুলো চকচক করছে। এ পরিবেশ অসহ্য। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলেও কেউ সাড়া দেবে না। এ যন্ত্রণা ভোগের চেয়ে মৃত্যু অনেক ভালো।

তাই তো ভাবছে সুমিত্রা। আত্মহত্যা কি সম্ভব? না তা সম্ভব নয়। ও রজ্জুবন্ধনে আবদ্ধ। সম্ভবত এ অবস্থা থেকে কোনোমতেই মুক্তি নেই। সুমিত্রার দেহটা শেয়াল-কুকুরেরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। সে থাকবে অসহায়। বাধা দেবার শক্তি থাকবে না। সুস্থ মস্তিষ্কে তাকে সমস্ত দেখতে হবে, সহ্য করতে হবে।

স্থূলরুচি, অশিক্ষিত, হীনমতি পশু দুটোর কদর্য অসৎ। কাণ্ড-কারখানা হয়তো সুমিত্রাকে পাগল করে দেবে। সুমিত্রার হাত পা বাঁধা। বাধা

দেবার শক্তিটুকু পর্যন্ত তার থাকবে না।

ওরা সুমিত্রাকে বেশ ভালভাবেই গাছের সঙ্গে বেঁধেছে। পালাবার উপায় নেই। ওরা বাস থেকে মদের বোতল বের করেছে। আর বের করেছে ছাল ছাড়ানো কয়েকটা মুরগী। কাট-কুটো জ্বেলে আগুন জ্বালিয়েছে। মুরগীগুলো বেশ করে আগুনে ঝলসাবে। ঝলসানো মুরগীর মাংসের সঙ্গে মদ ও নারীমাংস একটু একটু করে চেখে দেখবে। হা ঈশ্বর হাতের কাছে যদি রিভলবারটা থাকতো। এক গুলীতে ওদের খুলি উড়িয়ে দিয়ে মগজ বের করে ফেলতো সুমিত্রা। কিন্তু কাল রাতে রিভলবারটা সে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো। পেছন দিকে ফিরে তাকাতে ইচ্ছে করে না। সেখানে মস্ত একটা দুঃস্বপ্ন। গতরাত, না, ভাবা যায় না। অসহ্য। অসহ্য। অরুণাংশুর মুখটা বার বার মনে পড়ে। অরুণাংশুর দেহটা বোধ করি শেয়াল-কুকুরে টেনে ছিঁড়ে খাচ্ছে। খাচ্ছে আর খাচ্ছে।

ধৌলি প্রান্তরে ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছিলো। আর গত রাতে ওই ধৌলি প্রান্তরে এক বিশ্রী ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। সুমিত্রার রিভলবার থেকে দুটো গুলী। বাস সব শেষ। এরপর দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে সুমিত্রা দৌড় শুরু করেছিলো। অন্ধকারের ভেতর কতক্ষণ দৌড়েছিলো তার মনে নেই। এক সময় জ্ঞান হারিয়ে পথের ওপর পড়েছিলো। রাতের অন্ধকারে ভুবনেশ্বর থেকে বাস রুরকেল্লা অভিমুখে ছুটে চলেছিলো। ফাঁকা বাস। ভেতরে ছিলো দুটো নরপশু। যাত্রীহীন বাসের হেডলাইট পথের ওপর পড়তেই নরপশু দুটো বাসের গতি সংযত করে। উঠিয়ে নেয় নারীদেহটাকে। সযত্নে ধুলোবালি সাফ করে। মুখে চোখে জল ছিটিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনে। সুমিত্রার যৌবন ওদের কামপ্রবৃত্তিকে সুড়সুড়ি দেয়। ওরা বুঝেছিলো এ সহজ মেয়ে নয়। ভালো মিষ্টি কথার মানুষ নয়। ওদের দাবী দাওয়ার কথা জানতে পেরে একটা বিশ্রী কাণ্ড করে বসেছিলো। চলন্ত বাস থেকে ঝাঁপ দেবার চেষ্টা করেছিলো। তাই ওকে রজ্জু বন্ধনে আবদ্ধ করতে হয়েছে। ওকে বাঁধতে গিয়ে দুটো নর পশু হিমসিম খেয়েছে। কি প্রবল বাধা। বাপ। লোক দুটোর অনেক মেহনত

গিয়েছে। অনেক কাঠখড় পুড়োতে হয়েছে। সারারাত মেয়েটাকে বেঁধে রেখে বাস চালিয়ে ওরা বেদ ব্যাসের কাছে জঙ্গলে পৌঁছে গেছে। এখন নির্জন পরিবেশে ভোগ আর সুখ।

লোক দুটা প্রথমে ভেবেছিলো মেয়েটা সহজলভ্যা। পরে বুঝতে পারলো মেয়েটা মোটেও সহজ লভ্যা নয়। তাই যদি না হয় তবে রাতের অন্ধকারে পথের ওপর পড়েছিল কেন ? ওরা তো বারবনিতা বলেই ভেবে নিয়েছিলো। সাজ সজ্জায় ভদ্র ঘরের মেয়ে বলেই মনে হয়েছে। ওরা অনেক চেষ্টা করছে সুমিত্রার পেট থেকে কথা বের করবার জন্যে। সক্ষম হয় নি। সুমিত্রা রাতের অন্ধকারে পথের ওপর কেন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল তা জানবার জন্যে অনেক চেষ্টা ওরা করেছে। জানতে পারে নি।

সুমিত্রা শুধু ভাবছে। হা ঈশ্বর। হাতের কাছে রিভলবারটা যদি থাকতো। ওদের মগজ উড়িয়ে দেওয়া মোটেও কষ্ট সাধ্য কাজ ছিল না। যে রজ্জুতে দেহটা আবদ্ধ রয়েছে সে রজ্জুটা হাতের কাছে পেলে গাছের ডাল থেকে সে অনায়াসে ঝুলে পড়তে পারতো। রজ্জু বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারলে সে দৌড় শুরু করে ব্রাহ্মণী নদী পর্যন্ত পৌছুতে পারতো। তারপর অনায়াসে ব্রাহ্মণীতে ঝাঁপ দিতে পারতো। কিন্তু ওগুলোর কোনো কিছুই এখন সম্ভব নয়। যদি অলৌকিক কিছু ঘটে যায়। সুমিত্রা একজনকে হত্যা করেছে। আর এরা তাকে ধর্ষণ করে শেষে হয়তো হত্যা করবে। অপরাধের কোনো চিহ্ন রাখবে না। হাঙরগুলোর জিভ চক চক করছে। ভোরের সূর্য উঠেছে। উঠে যাবে মধ্য গগনে। অপরাহ্নে সে সূর্য পশ্চিম গগনে ঢলে পড়বে। শিমূল ফুটবে। ঝরবে। নরপশুগুলো হাসছে। এরা কতো নারীর সতীত্ব নষ্ট করেছে কে জানে। কতো মুনুষ্য খুন করেছে তার হিসেব নেই। এদের চেহারা রকম সকম চম্বলের ডাকাতদেরই মতো। এরা নিছক বাস ড্রাইভার কণ্ডাকটার নয়। বাসের ব্যবসা থেকেও বড়ো ব্যবসা এদের নিশ্চয়ই রয়েছে। এরা নিশ্চয়ই দু'জন নয়। দুজনের পেছনে অনেক অনেকজন রয়েছে।

হঠাৎ। হ্যাঁ হঠাৎ সুমিত্রার মনে একটা কথা খেলে যায়। এ চিন্তাধারার জন্যে সুমিত্রা মোটেও প্রস্তুত ছিল না। সেই চিরন্তন ত্রিভুজের সৃষ্টি করা যায় না? কায়াময়ী মায়াময়ী হয়ে ওদের ভেতর ভাঙন ধরানো কি খুবই কঠিন কাজ। যুগ যুগ ধরে নারী যে অস্ত্রের ব্যবহার করে এসেছে। তিলোত্তমার রোলে অভিনয় করতে দোষ কি? মিষ্টি কথা। মৃদু হাসি। মধুর ভাষণ। কটাক্ষপাত। একজনের অনুপস্থিতে অন্যজনাকে তাতিয়ে তোলা।

লোক দুটো দক্ষযজ্ঞ বাধাবার আগে সাজসরঞ্জাম গুছিয়ে নিচ্ছে। ভোগ করবার আগে নিজেদের ভালভাবে প্রস্তুত করে নিচ্ছে। সুরা আর ঝলসানো মাংসের সঙ্গে নারীসঙ্গ। পরম লোভনীয়। সুমিত্রা মনে মনে ভাবে একটা পৈশাচিক কাণ্ড ঘটবার আগে, বাঘের থাবা পড়বার আগে, একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা ভালো। সুমিত্রা ভাবে গতরাত্রে সে নিজেই বা কি কাণ্ডটা করলো। প্রেমের অভিনয় করে হত্যা করলো তার প্রিয় সঙ্গীকে। সব কিছুই যেন একটা দুঃস্বপ্ন। স্বর্গ মর্ত পাতালে কি কেউ নেই যে বা যারা তাকে এ দুঃসহ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দিতে পারে। তার পাপেরই কি এভাবে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তাদের গোষ্ঠী ঈশ্বরকে মানতো না। কিন্তু তবুও এই মুহূর্তে কেন ঈশ্বরকে তার এভাবে মনে পড়ছে। ঈশ্বর যদি থাকে তবে সে কি এতোই নির্দয়। এরকমভাবে প্রতি-শোধ নেয়। এর চেয়ে বন্দুকের গুলীতে মরা সুখের ছিল। আত্মহত্যা আরো সুখের।

সুমিত্রার এখনো স্পষ্ট মনে আছে। সে পিস্তলের ঘোড়া টিপলো। পর পর শব্দ। আগুনের ঝিলিক। খানিকটা ধোঁয়া। আর্ত চীৎকার। সে পরিষ্কার দেখতে পেলো অরুণাংশু যন্ত্রণায় গড়াচ্ছে। কাতরাচ্ছে। তার পরই সুমিত্রা দৌড় শুরু করলো। সুমিত্রা দৌড়ুচ্ছিলো। কাঁটা, ঝোপ আগাছা, পাথর, কাঁকর কতো কিছু টপকালো সে। রুক্ষ মাটির ওপর দিয়ে প্রাণপণ বেগে দৌড়ুলো সুমিত্রা। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিলো তার। প্রতিমুহূর্তে মনে হয়েছে সামনে এক অতলস্পর্শী খাদ। তাকে গিলে

খাবার জন্যে হাঁ করে আছে। ধূসর অন্ধকার প্রান্তরটা এক ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছিল। অন্ধকার কাঁপছিল। ঝোপঝাড় কাঁপছিল। সব কিছু থর থর করে কাঁপছিল। কোনো উপায় ছিল না সুমিত্রার। অরুণাংশুর ওপর দলের সবাইকার সন্দেহ দিন দিন বেড়েই চলেছিল। দলপতির আদেশ হয়েছিল সুমিত্রাকেই ওকাজ সম্পন্ন করতে হবে। আর দলপতির নির্দেশ মতো কাজই সুমিত্রা করেছে। নরপশু দুটো ওরই দেহটা নিয়ে স্ফূর্তি করবে। আমোদ আহ্লাদ করবে। তারপর তাকে হত্যা করবে। হত্যা করে নিশ্চল নিষ্পন্দ দেহটা হয়তো ছুঁড়ে নদীর জলে ফেলে দেবে। কেউ জানবে না। কেউ খোঁজ পাবে না। নয়তো অরণ্যের ভেতর ফেলে রেখে যাবে। দেহটাকে নেকড়ে শেয়ালের দল ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। ওরা কাঠ লতাপাতা যোগাড় করে মাংস পোড়াচ্ছে ঝলসাচ্ছে। সারি দিয়ে মদের বোতল সাজানো। সুমিত্রা ভাবে প্রেম, ভালবাসা, বিশ্বাস, প্রীতি, মায়া, স্নেহ, সব ধৌলি প্রান্তরে ধুয়ে মুছে সাফ। ওখানে রুধিরে আপ্লুত হয়ে পড়ে আছে একটা দেহ।

আর এখানে পড়ে থাকবে ধর্ষিতা হয়েছে এমন একটি নারীর দেহ। কারখানায় মজুর পরিশ্রম করবে। মাঠে কৃষক লাঙ্গল চষবে। পরিবারে শিশু কাঁদবে, হাসবে। স্বামী স্ত্রী ভালবাসা ভালবাসা খেলা খেলবে। আর ওদের দেহ দুটো পড়ে থাকবে। ক্ষত বিক্ষত, পরাজিত, লাঞ্ছিত, পরিত্যক্ত, অবহেলিত অবস্থায়।

লোক দুটো ঘন ঘন সুমিত্রার দিকে তাকাচ্ছে। আর ফ্যাক্ ফ্যাক্ করে হাসছে। গোঁফে তা দিচ্ছে ঘন ঘন। একজন বললে—শালা, খানিকক্ষণের ভেতর খেলা জমবে ভালো।

—খালি মাস্তানি। আগে সব গুছিয়ে নে। ব্যাটার তর সয় না। জীবনে তো রঙের খেলা খেললি অনেক বার।

—খাপ্পা কেন বাবা।

শয়তান দুটোর চোখ চক্ চক্ করছে। জিভ দিয়ে লাল ঝরছে। চাহনি বুলোচ্ছে সুমিত্রার সারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। মাপজোখ নিচ্ছে। সুমিত্রার

ইচ্ছা হচ্ছিলো ওদের মাংস কাটা ছুরিটা ছিনিয়ে নিতে। একবার ছুরিটা পেলে নিশ্চিন্তে ওদের বুকে বসিয়ে দিতো। বাঘিনীর মতো ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো।

একজন সুমিত্রাকে লক্ষ্য করে বলে—জানো ওর নাম সূরয। আর আমার নাম ভোলা। কাকে তোমার বেশী পছন্দ হয়। বলেই লোকটা মুচকি মুচকি হাসে।

সুমিত্রা একরাশ থুতু ওদের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দেয়। লোক দুটো নিঃশব্দে হেসে ওঠে। ওরা কতোক্ষণ কি ফিসফাস করলো কে জানে। এরপর ভোলা রইলো জিনিসপত্র আর সুমিত্রাকে আগলাবার জন্যে। সূরয রওনা দিলে ব্রাহ্মণীতে স্নানটা সেরে আসবার জন্যে।

আর এ সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিলো সুমিত্রা। সূরয অবাঙালী। বিরাট দেহটা দোলাতে দোলাতে সূরয চলে গেল। ভোলা খাঁটি বাঙালী। সূরয চলে যেতেই সুমিত্রা একটু মৃদু হেসে বললো—একটু জল খেতে দেবে। বড্ডো পিপাসা পেয়েছে।

—পিয়াস লেগেছে? পানী দেবো? বলে ভোলা। সূরযের সঙ্গে থেকে থেকে ওর বাংলা বলা কওয়াটা কেমন অবাঙালীর মতো হয়ে গেছে। এরপরই ভোলা হেঁ হেঁ করে হাসে। ময়লা হলুদ দাঁতের সারি বের করে দেয়। জল দেবার সময় সুমিত্রার হাতের আঙুলগুলো বেশ জোরে চেপে ধরে। বাধা দেয় না সুমিত্রা। বরং সহজ করে দেয় আরো খানিকটা। ভোলা ভাবে আগের কয়েকটা দিন ফালতু কেটেছে, আদিবাসী মেয়েটাকে এনেছিলো স্ফূর্তি করতে। হারামী মেয়েটা পালিয়ে গেল। আর শুধু পালিয়ে যায় নি। সঙ্গে নিয়ে গেল ওদের হাত ঘড়িটা, একটা ট্রানজিসটার, আর টাকা ভর্তি মনিব্যাগ দুটো। আরো কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস, তা যে গেছে যাক। বদলে এসেছে ভালো বস্তু। একেবারে বড়ো ঘরের মেয়ে। ভোলা সুমিত্রার হাতের আঙুলগুলো টিপতে থাকে। সুমিত্রা ভাব দেখায় কতো যেন মজা পাচ্ছে। কিশোরীর মতো সলজ্জ হাসি হাসে সে অনবরত।

কিন্তু সত্যি বলতে কি। পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা সরীসৃপ নেমে যায় যেন।

কাম-সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে লোকটা। ওর নখগুলো যেন ঠিক ইস্পাত। লোকটা সুমিত্রার নরম মাংসে নখগুলোর চাপ দেয়। নখ বিঁধে যায় নরম মাংসে। জ্বালা ধরে যায়। সুমিত্রার আপত্তি না দেখে নেকড়ে বাঘের দৃষ্টি নিয়ে তাকায় ওর দিকে। বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে দেখে সে অরণ্যের শাল গাছগুলোকে।

—মাইরি তোমার আঙুলগুলো ফার্স্ট ক্লাশ। এমন আঙুল শালা পাই নি কখনো। তারপর লোভী দস্যুটা সুমিত্রার সারা দেহে কুৎসিৎ কদর্য দৃষ্টি বুলোয়। মাথা থেকে পা পর্যন্ত।

সুমিত্রা বলে—বড্ডো ক্ষিদে পেয়েছে। কিছু খেতে দেবে?—শালা দেবো না আবার। আলবাৎ দেবো। বাপের নামে কিরে। তবে এখন নয়। আমরা তিনজনে বসে তারিয়ে তারিয়ে খাব।

—তোমার সূরয যদি আমাকে খেতে না দেয়।

কেমন আবদারের সুরে ছোটখুকীর মতো বলে সুমিত্রা।—আরে ও বললেই হল নাকি। আমি রয়েছি না। তা ধেনো না বিলেতী? কোন্‌টা চলবে?

—ওসব আমি খাই নে। ও সব ভালো না।—যাও। যাও, সারারাত বকর বকর করলে। এখন এসেছো আবার জ্ঞান দিতে। মাইরি মেয়েমানুষদের বোঝা দায়। তুমি বলতে চাও তুমি খুব ভালো মেয়েমানুষ।

—তোমার কি মনে হয়। বলে সুমিত্রা।

—লাও ঠ্যালা সামলাও। তুমি বলতে চাও তুমি ভালো মেয়েমানুষ। আমাকে বোঝাতে চাও যে, তুমি ভালো মেয়েমানুষ। রেতের বেলা জঙ্গলা পথে যে পড়ে থাকে সে ভালো মেয়েমানুষ। মোটরের ভেতর পুরুষমানুষটা স্ফূর্তি লুটেছে তারপর ধাক্কা দিয়ে সড়কের ওপর ফেলে দিয়ে চম্পট। কি ঠিক বলি নি?

—তোমরা বাস চালিয়ে যাচ্ছিলে। তোমরা কি করলে?

—বাস থামালাম। তোমার দেহটা নেড়ে চেড়ে দেখলাম। না কোনো রকম এ্যাকসিডেন্ট নয়। শরীরে জোর জবরদস্তির লক্ষণও পেলাম না কিছু। তোমাকে তুলে ফেললাম বাসে।

তারপর জলটল ছিটিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনলাম। আর তখন থেকে ভোর পর্যন্ত যে কষ্টটা তুমি আমাদের দিয়েছো। বাপ। তাইতে দড়ি দিয়ে বাঁধতে হল। মুখে রুমাল চাপা দিতে হল।

ভোলা দিব্যি তখনো সুমিত্রার হাতের ওপর নিজের আঙুলগুলো চালিয়ে যাচ্ছে।

সুমিত্রা বলে—এ জায়গাটাতে এর আগেও নিশ্চয় অনেক কুকর্ম করেছো।

হেঁ হেঁ হেঁ করে হাসে ভোলা।

—জায়গাটা ওস্তাদের খুব পছন্দ। তা তুমি তো সতী লক্ষ্মী নও। তোমার দুঃখটা কিসের। বলে ভোলা।

—না দুঃখ নেই। আমার দুঃখ যে তোমরা আমার দুঃখটা বুঝতে পারছো না। সেই গাছের সঙ্গে কখন থেকে বেঁধে রেখেছো। ভালো লাগে কারো এতোটা সময় বাঁধা অবস্থায় থাকতে। তোমাদের শরীরে দয়ামায়া বলে কিছু নেই।

—খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি ?

—না সুখ পাচ্ছি। তোমার বুদ্ধিটা ভোঁতা। মেয়েছেলের দেহটা তোমাদের কাছে বড়ো। মনটা কিছু নয়।

—মনটন বাপু আমরা বুঝি নে। ওসব মনের ব্যাপারী আমরা নই। ভোগ সুখ করো। তারপর জঙ্গলের ভেতর দেহটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চম্পট দাও। দু'চার দিন চুপ মেরে থেকে আবার নতুন মালের খোঁজে বের হও। এরপর মদ গাঁজা আফিং চোরাই চালানের ঝামেলা রয়েছে। চোরা কারবারী, মহাজন, দুষমন, পুলিশ, মারপিট ; ঝুটঝামেলা অনেক।

—আমি যদি না পালাই। বলে সুমিত্রা।

—থামো তো। মিছে বকর বকর করছো।

একটি মেয়েকে এখানে এনে ফেলেছিলাম। তার হাত পায়ের দড়ি-দড়ার

ব্যবস্থা ছিল না। বেটি হঠাৎ দৌড় শুরু করলে। আর সে কি দৌড়। ছুটো পুরুষ মানুষকে কুপোকাৎ করে চম্পট। দৌড় আর দৌড়। পুরুষ-মানুষ ছুটো নাজেহাল। বর্ষাকাল। ব্রাহ্মণী ফুলে ফেঁপে একাকার। জলে কি কারেন্ট, বাপ্। মেয়েটা ঝাঁপিয়ে পড়লো ওই জলে। ডুবেই মরলো ব্রাহ্মণীর জলে। দেহটার আর পাত্তা মিললো না। শোনো তুমি মদ খাও তো?

—না। মাথা নাড়ে সুমিত্রা।

—খাও না একটু। বলে ভোলা।

—উঁহু। সুমিত্রা মাথা নাড়ে।

—এক ঢোক মদ গিলে ফ্যালো যদি তবেই তোমাকে একটা সুবিধে করে দেবো।

—কি সুবিধে? জিজ্ঞেস করে সুমিত্রা।

—হাতের দড়ির বাঁধন খুলে দেবো।

—পায়ের দড়ি।

—সেটাও খুলে দিতে পারি যদি তুমি কিরে কাটো নেমকহারামি করবে না। পালাবার চেষ্টা করবে না।

—দাও গ্লাসে মদ ঢেলে দাও।

—খাবে তুমি?

—হাঁ খাবো। বলে সুমিত্রা।

ভোলাকে দেখে মনে হয় খুশী যেন উছলিয়ে পড়ছে। সে গ্লাসে মদ ঢেলে সুমিত্রার মুখের কাছে ধরে। কয়েক ঢোক গিলে সুমিত্রা সেটা শেষ করে দেয়।

—বলো পালাবে না।

—না।

—কিরে কাটো। বেদব্যাসের নামে কিরে কাটো।

—বেদব্যাসের নামে কিরে কাটছি পালাবো না।

মহাখুশী হয়ে ভোলা ছুরি দিয়ে ওর হাতের বাঁধন কাটতে থাকে।

কয়েক মিনিট ছুরি চালিয়ে হাতের বাঁধন কেটে দেয়। হাত ছুটোতে রক্ত জমে উঠেছিলো। হাত ছুটো নাড়াচাড়া করে সুমিত্রা। কি আরাম। কি স্বস্তি।

আবাব মদ ভরে মদের গ্লাসটা ভোলা এগিয়ে দেয়। এক চুমুকে শেষ করে সুমিত্রা। ভোলা হঠাৎ এগিয়ে এসে সুমিত্রাক গালে একটি সোহাগ চুম্বন এঁকে দেয়। সুমিত্রার সারা গালটা যেন জ্বলে যায়। বিরক্তিতে মনটা ভরে ওঠে। সারাটা মন গ্লানি আর ধিক্কারে ভরে ওঠে। কিন্তু ভাবান্তর ঘটে না। কচি কিশোরীর মতো চোখে মুখে সলজ্জ হাসি। অভিনয়। সবটুকুই অভিনয়। তাছাড়া সুমিত্রা আর কি করতে পারে।

—এবার পায়ের দড়িটা কাটো।

—একটা সিগারেট টানবে ?

—দাও। নির্বিকার কণ্ঠে সুমিত্রা বলে।

খুশীতে ভোলা গদগদ। সিগারেট দেয়। আগুনটা এগিয়ে দেয়। সুমিত্রা সিগারেট ধরিয়ে সুখটান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ে।

—আমার গুরুর কারো ওপর বিশ্বাস নেই। আমাকে সব সময় বলে মেয়েমানুষকে কখনো বিশ্বাস করবি নে। ওরা ঠকাতে ওস্তাদ। তা গুরুর এ মতে আমি কখনো সায় দিতে পারি নে। তা হলে তো মা, বোন, মেয়ে স্ত্রী সবাইকে সবসময় অবিশ্বাস করতে হয়।

—তোমার বুঝি তোমার গুরু মানে ওই স্নান করতে গেল যে লোকটা তার ওপর অগাধ বিশ্বাস।

—আরে বাপ্‌স্। বিশ্বাস না করে উপায় আছে নাকি। কতো গুণ ওর গুরু কলকারখানায় দাঙ্গা বাধাতে দারুণ ওস্তাদ। ছুর্দান্ত চাকু চালায়। বোমাবাজীতে ভীষণ রপ্ত। এক হাঁড়ি মদ গিলে বেহুঁশ হবে না। মনে এতোটুকু ভয়ডর নেই। গুণ্ডা বদমায়েসকে শায়েস্তা করতে ওর জুড়ি নেই। পুলিশের লোকেরা ওকে খাতির করে। আর দালালরা হাতে পায়ে ধরে খোসামোদ করে। কি আর এক ঢোক হবে নাকি ?

সুমিত্রা মাথা নেড়ে জানায় এখন আর সে মদ গিলবে না। সুমিত্রার

গালে আর একটা চুমু দিয়েসে নিচু হয়ে সুমিত্রার পায়ের বাঁধন কাটতে শুরু করে। খানিকক্ষণ পরে সুমিত্রা টানটান হয়ে মাটির ওপর দাঁড়ায়। এতোক্ষণ পর সে সম্পূর্ণ মুক্ত। কি আরাম। দুটো হাত সে শূন্যে ছুঁড়ে দেয় বার কয়েক। পা দুটো ঝাড়া দেয় ঘন ঘন।

—জানিনে সূরয এসে কি বলবে আমাকে। বড্ডো রোখাচোখা মানুষ ও।

—তুমি মিথ্যে এতো ভয় পাও ওকে। তুমি পুরুষ মানুষ না? বলে সুমিত্রা। ওকে সুমিত্রা তাতিয়ে তুলতে চেষ্টা করে।

—ওকে কে ভয় পায় না বলো। সারা তল্লাটের লোকেরা ওকে ভীষণ ভয় পায়। রাউরকেল্লার পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখবে লোকেরা ওকে কি রকম ভয় পায়। বাসের গুপ্ত জায়গায় পিস্তল, পাইপগান, গোলাগুলি সব মজুত। খুন, জখম, রাহাজানি, ডাকাতি, ধর্ষণ অনেকগুলো কেস ওর মাথার ওপর ঝুলছে। পুলিশ এসে গেলে আর পালাবার পথ না পেলে সমানে গোলাগুলি চলবে। এমনি মানুষ ও।

ভোলার হঠাৎ খেয়াল হয় উনুনের আঁচ কমে এসেছে। সে নিচু হয়ে উনুনে ফুঁ দিতে শুরু করে! মাংসটা ভালো করে ঝলসাতে হবে। ওর পেছনে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে সুমিত্রা বসেছিলো। উনুনে আঁচ জোর করবার ফাঁকে ফাঁকে ভোলা কথা বলে যাচ্ছিলো।

—সেদিন খুব বেঁচে গেছি।

—কি রকম? বলে সুমিত্রা।

শালা বদমাস মাণিকটা বেইমানী করলে। পুলিশের কাছে সব ফাঁস করে দিলে।

ট্রাকে চোরাই চালান যাচ্ছিলো রাউরকেল্লার দিকে। পার্টি সেখানে টাকা নিয়ে হাজির ছিল। হঠাং মধ্য রাস্তায় টিকটিকি পেছন নিলে। বেআইনী মাল পাকড়াবার জন্যে আমাদের ট্রাকের পেছনে জীপ ছোটালে। রেতের বেলা আমরা যতো জোরে ট্রাক ছোটাই পুলিশের জীপ তার চেয়ে জোরে ছোটে।

—তারপর?

—গুলী ছুটলো। দু'তরফে গুলী। টিকটিকিরা পরপর দশ রাউণ্ড গুলী ছুঁড়ে আমাদের ট্রাকের টায়ার ফাটিয়ে দিলো। ট্রাক কাৎ হয়ে পড়লো। আমরা ট্রাক থেকে লাফিয়ে পড়ে গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে পগার পার। মাল ধরা পড়লো। সে যাত্রা বড্ডো জোর বেঁচে গেছি। নদী সাঁতরিয়ে পগার পার। এক ফাঁকে ভোলা তার মুখটা সুমিত্রার মুখের খুব কাছে নিয়ে এসেছিলো। দিশী মদের গন্ধে সুমিত্রার শরীরটা কেমন যেন গুলিয়ে ওঠে। সে হাত দিয়ে ওর মুখটা সরিয়ে দেয়।

—এখন নয়। মৃদু হেসে বলে সুমিত্রা। ভোলার চোখে তার দৃষ্টির পরশ ছুঁইয়ে দেয়। গলে জল হয় ভোলা।

—এসব কাজ কবে থেকে শুরু করেছো?

প্রশ্ন করে সুমিত্রা।

—চৌদ্দ পনেরো বছর থেকে শুরু হয়েছে। চুরি, চামারি লুটপাট খুন জখম কতো করেছি তার হিসেব রাখি নি। কয়েকবার জেল খেটেছি। ভোলা ময়লা দাঁত বের করে হাসতে শুরু করে।

—লেখাপড়া করেছো?

—এই ক্লাস সেভেন পর্যন্ত। দেশ ভাগ হবার সময় বাবা মা দু'জ'নেই খতম। কাকা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলো। দুটো খেতে দিতো। খাটিয়ে নিতো ষাঁড় গাধা কিংবা খচ্চরের মতো। আর খালি পেঁদানি। শালা মারতে মারতে সারা শরীরে কালসিটে ফেলে দিতো। কথা বলতে বলতে ভোলা মদের গ্লাসে আরো কয়েকবার চুমুক দিয়েছে। সুমিত্রার দিকে পেছন ফিরে উনুনের কাঠে ফুঁ দিচ্ছে। আগুনটার নিভু নিভু অবস্থা। আগুন ধিক্ ধিক্ করে জ্বলছে। উনুনটা থেকে প্রচুর ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ভোলা সমানে ফুঁ দিয়ে যাচ্ছে চোখ দিয়ে অনবরত জল ঝরছে। মাংসটা ভালো করে ঝলসাতে হবে।

—কি আর দু এক চুমুক হবে নাকি? ভোলার প্রশ্ন।

—না। না। সুমিত্রা এ মুহূর্তে মদ গিলতে রাজী নয়। মাংসটা বেশ করে ঝলসিয়ে নাও। তোমাদের দু'জনের চানটান শেষ হোক। তারপর

মাংসের সঙ্গে বেশ ছু'চার ঢোক গেলা যাবে। বেশ জমিয়ে জমিয়ে বলে সুমিত্রা। খুশীতে আনন্দে ভোলার চোখ ছুটো বুজে আসে।

– বেশ। বেশ। তোমার কথা মতোই কাজ হবে।

—আচ্ছা চুরি ডাকাতি খুন জখম করে যাচ্ছো পুলিশ নিশ্চয়ই তোমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে।

—খুঁজছে না আবার। গুরুর কথা ছেড়ে দাও। আমার মাথার ওপর পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার করে দশ হাজার টাকার অঙ্ক ঝুলছে। কেউ ধরিয়ে দিলে সে টাকাটা পাবে!

—অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে রাখো তো?

—তা আবার রাখি নি। ঐ যে ট্রাকটা দাঁড়িয়ে রয়েছে ওর ভেতর পিস্তল পাইপ গান সব লুকোনো। গোলমাল দেখলে ওখান থেকে বের করতে কতক্ষণ। ভোলা উপুড় হয়ে পড়ে উনুনে জোর ফুঁ দিতে শুরু করেছে।

—তোমার গুরুর ফিরতে বেশ কতটা সময় লাগবে? এরপর আবার তুমি চান করতে যাবে। এদিকে ক্ষিদেতে আমার পেট জ্বলে যাচ্ছে।

– গুরু নদীতে নেমে জপতপ সন্ধ্যাহ্নিক করবে।

—এসব দিকে দেখছি পুরো খেয়াল রয়েছে।

ওসব সম্বন্ধে টনটনে জ্ঞান। এদিকে খুন, জখম, চুরি, ডাকাতি করে যাচ্ছে। অন্যদিকে ধর্মকর্মে ফাঁকি দিচ্ছে না। ওপারের ব্যবস্থা পাকা করছে।

—তোমার এসবে বিশ্বাস নেই? প্রশ্ন করে সুমিত্রা।

—একদম নয়। ভোলা জমির ওপর একেবারে টান হয়ে শুয়ে পড়ে উনুনটাতে ফুঁ দিতে থাকে। আর সুমিত্রা এ সুযোগেরই অপেক্ষা করছিলো। সে একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে প্রথমে কয়েক পা নিঃশব্দ চরণে পিছিয়ে যায় তারপর সূরয যে পথে স্নান করতে গিয়েছিলো তার বির্পরীত পথে ছুট লাগায়। ধরা পড়লে অসহ্য নিপীড়ন। এবং সর্বশেষ মৃত্যু। আর ধরা না পড়লে সে যাত্রা মুক্তি। নতুন জীবনের শুরু। সুতরাং শরীরের সর্ব শক্তি প্রয়োগ করে সে ছুট লাগায়। ভোলা টের পেতে

পেতে দৌড়িয়ে সুমিত্রা অনেকটা দূরে চলে গেছে। ভোলা সোজা হয়ে দাঁড়ায় তারপর শিকারী কুকুরের মতো শিকারের পিছু ধাওয়া করে। ধরতে পারলে ছুঁড়িটার মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। নেমকহারাম বদমাস মেয়েটা। শেষপর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করলো। সুমিত্রা প্রাণ-পণে ছুটছে। সে মাঝে মাঝে বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করছে। ছুটছে আর ছুটছে সুমিত্রা। পেছনে তাকে অনুসরণ করছে রক্তলোলুপ ভোলা। ধরতে পারলে ওকে ভোলা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। রক্তলোলুপ পিশাচটা। নেমকহারাম বেইমান মেয়েটা :

সৌরভ জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। মাঝে মাঝেই সে এমনি জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে চায়। দূর দূর গাঁয়ের মানুষগুলো আদিবাসী। তাদের দৈনন্দিন জীবন, আট-পৌরে সুখ-দুঃখ, খোলা আকাশ, গাছপালা, রুক্ষ মাটির স্পর্শ, পাতা ঘাসের মন মাতানো গন্ধ খুবই ভালো লাগে তার। বেদব্যাসের সন্নিকটে গুরুকুল বৈদিক আশ্রমে থেকে সে অধ্যাপনা করে। যথেষ্ট পরিমাণে শরীর চর্চা করে। সংস্কৃত পাঠ করে। হিন্দুদের পুরনো ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে। নিজে একটা আশ্রম প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছে। জঙ্গলের ভেতর সৌরভ এগুচ্ছিলো। হঠাৎ নারীকণ্ঠের ভয়ার্ত চিৎকার শুনে তার ব্যায়ামপুষ্ট দেহটা নিশ্চল হয়। 'কে আছ? বাঁচাও আমাকে'। মুহূর্তে সৌরভ ঘুরে দাঁড়ায় এবং শব্দ লক্ষ্য করে দৌড় শুরু করে। কাঁটা-ঝোপ পাথরের খেয়াল না করে।

ভোলা ততক্ষণে সুমিত্রাকে প্রায় ধরে ফেলেছে। সুমিত্রা একটা গাছের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে। ততক্ষণে ধরা ছোঁয়ার খেলা চলেছে। বিরাট গাছটাকে মাঝখানে রেখে দুটো মানুষ বোঁ বোঁ করে ঘুরপাক খাচ্ছে। একজনের ধরবার প্রচেষ্টা। আর একজনের ধরা না দেবার চেষ্টা। সৌরভ পৌঁছে গেছে সেখানে। খানিকটা সময় সে লক্ষ্য করলো সব কিছু, বুঝতে পারলো গুণ্ডার হাত থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা চালাচ্ছে মেয়েটা প্রাণপণে। সৌরভ মুহূর্তকাল অপেক্ষা করে নি। দীর্ঘ দেহটা একবার

টান করে বিদ্যুৎ গতিতে এগিয়ে গেল সৌরভ আর পলকের ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়লো পশুটার ওপর। অতর্কিতে, ভোলাকে কোনোরকম সুযোগ না দিয়ে। ভোলা এর জন্যে খুব প্রস্তুত ছিল না। সে মাটিতে গড়িয়ে পড়লো। কিন্তু ভোলা এ লাইনে রীতিমতো দক্ষ। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে আক্রমণ করলো সৌরভকে, শুরু হলো মল্লযুদ্ধ। পাঁচ মিনিট চললো কীল চড় ঘুষো বৃষ্টি। দু'জনে চেষ্টা করলো দু'জনকে কাবু করবার। সুমিত্রা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে সবকিছু। হতভম্ব হয়ে গেছে সে। ভোলার কোমরে একটা গামছা জড়ানো ছিল। সেটা দিয়ে ভোলা সৌরভের গলায় ফাঁস দিয়েছে। গামছার দু প্রান্ত ধরে প্রাণপণে টানছে ভোলা। সৌরভের শ্বাসবন্ধ হয়ে আসছে। চোখ দুটো কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। সৌরভের পরাজয় নিশ্চিত।

সুমিত্রা সময় নষ্ট না করে এক খণ্ড ভারী পাথর কুড়িয়ে নেয়। আর সেই পাথরখণ্ড দিয়ে ভোলার মাথায় কয়েকবার প্রাণপণ শক্তিতে আঘাত করে। সুমিত্রা সমস্ত শক্তি দিয়ে ভোলার মাথায় আঘাত করেছিলো। পশুটা জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

এরপর সৌরভ আর সুমিত্রা ছুটতে থাকে। জঙ্গলা পথ ধরে দৌড়য়, লক্ষ্য ব্রাহ্মণী নদী। ওরা দৌড়ুচ্ছে আর দৌড়ুচ্ছে। কাঁটার খোঁচা খেয়ে পা রক্তাক্ত। খেয়াল নেই। ভোলার সঙ্গী কজন আছে কে জানে। ভাবে সৌরভ। সূরযের কথা ভোলে নি সুমিত্রা।

অনেকটা পথ ওরা দৌড়ে পার হয়েছিলো। পথে দেখা হয়েছে কয়েক জন কাঠুরে বা রাখাল বালকের সঙ্গে। ওদের দু'জনকে দৌড়ুতে দেখে তারা বিস্মিত চমকিত। সৌরভ আর সুমিত্রা কিন্তু থামে নি। তাদের লক্ষ্য নদী। তারা পরস্পর পরস্পরকে চেনে না। সৌরভ সুমিত্রার কাছ থেকে গল্প কাহিনী শুনতে চায় নি। সৌরভ জেনেছে সুমিত্রা এক নারী। যে কোনো ভাবে গুণ্ডার কবলে পড়েছিলো। আর সুমিত্রা জেনেছে ভগবান ত্রাণকর্তা পাঠিয়েছেন। একে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায়।

ওরা পৌঁছে গেছে ব্রাহ্মণীর তীরে। না কোথাও সূরযের চিহ্ন নেই। একটা নৌকো তীরে বাঁধা রয়েছে। আর এক মুহূর্ত এখানে নয়। যে করে হোক ওপারে পৌঁছুতে হবে। নৌকোর দড়ি খুলে ছু'জনে লাফিয়ে নৌকোতে উঠে পড়ে। নৌকো জল কেটে এগিয়ে চলে। বৈঠা ধরেছে সৌরভ আর সুমিত্রা ছু'জনেই। জল কেটে নৌকো তরতর করে ছুটে চলেছে। ধীবর কন্যা মৎস্যগন্ধা একদিন নৌকোতে পার করেছিলো পরাশরকে। মাঝ নদীতে তাদের আলাপ পরিচয়। তারপর প্রেম, গর্ভ-সঞ্চার। আর ওদের মিলনে জন্মেছিলো ব্যাস যিনি মহাভারত রচনা করেছিলেন। বৈঠা ছেড়ে ছই-এর ভেতর বসেছে সুমিত্রা। বিশ্রাম নিচ্ছে সে। বড্ডো ধকল গেছে তার শরীরটার ওপর দিয়ে। গতকাল সন্ধ্যা থেকে আজ পর্যন্ত। মনের পর্দায় কতো ছবি। ছবিগুলো মোটেই সুখ আর আনন্দের সৃষ্টি করে না। সে শরীর থেকে ধূলোবালি ঝেড়ে ফেলেছে। সে শাড়ীটা ঠিক করে নিয়েছে। সৌরভ নৌকো চালাচ্ছে। আড়চোখে এক একবার সুমিত্রাকে দেখে নিচ্ছে।

সুমিত্রা প্রশংসার দৃষ্টি বুলোচ্ছে ওর সর্বাঙ্গে।

সুমিত্রার মনটা অকারণে চঞ্চল হয়ে উঠতে চাইছে। কিন্তু একে প্রশ্রয় দেওয়া তার উচিত হবে না। গত সন্ধ্যার ঘটনাবলী মনের ভেতর বড্ডো স্পষ্ট। সমস্ত দেহটা ওর কেঁপে কেঁপে ওঠে। সে মনে মনে ভাবে—না না। আর পুরুষের কাছাকাছি আসা উচিত হবে না।

সে হত্যা করেছে। সে হত্যা করেছে একটি পুরুষ মানুষকে। আর ওই পুরুষ মানুষদেরই একজন তাকে আজ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। ফিরিয়ে দিয়েছে মান সম্ভ্রম। অবাধ্য চোখ ছুটো বারবার দৃষ্টি ফেলতে চায় সামনের সুন্দর সুশ্রী দীর্ঘ দেহধারী পুরুষটির প্রতি। আর ওই সুন্দর যুবাপুরুষ তাকিয়ে তাকিয়ে সুমিত্রাকে দেখছে। লজ্জা নেই। সরম নেই। নৌকো তরতর করে জল কেটে চলেছে।

নৌকো নদীর ওপারে পৌঁছে গেছে। ছু'জনে মিলে নৌকোটাকে বাঁশের খুঁটির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে তীরে নেমে পড়েছিলো। সময়টা কখন

কিভাবে কেটে গেছে দু'জনে মোটেই টের পায় নি। পরস্পর পরস্পরের রূপে গুণে মুগ্ধ। কথা তাদের কম হয়েছে। পরস্পর-পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি হেনেছে। চোখে চোখে অনেক কথা হয়েছে। দু'জন দু'জনকে জেনে নিয়েছে। দু'জন দু'জনের অনেক কাছাকাছি এসে গিয়েছে। কাছের একটা সরাইখানায় দু'জন চা পাঁউরুটি খেয়ে নিয়েছে। এর আগে নদীর জলে দু'জনে হাত মুখ ধুয়ে নিয়েছিলো।

এরপর দু'জনে সড়ক ধরে এগিয়ে চলেছে। সুমিত্রা যাবে রাউরকেল্লা অভিমুখে। সৌরভ ওর সঙ্গে যেতে চেয়েছিলো। কি জানি পথে যদি আবার কোনো বিপদ আপদের সম্মুখীন হয় সুমিত্রা। কিন্তু সুমিত্রা রাজী হয় নি। সুমিত্রা জানে না তার গন্তব্যপথ। সে খুনী। দলের লোক-দের কাছে সে ফিরে যায় নি। তারা তাকে কি ভাবলো কে জানে? অরুণাং-শুর পরিণতির কথা ভেবে সে শিউরে শিউরে উঠছে। অরুণাংশুর দেহটা হয়তো শেয়াল গৃধিনী ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে। সে খুনী। জীবনে এই প্রথম সে খুন করলো। সে আর ওদের দলে ফিরে যাবে না। সে দল-ত্যাগী হবে। ফিরে যাবে সে কলকাতায়। কলকাতায় থাকা নিরাপদ হবে না। দলের বাদবাকী সবাই ওকে খুঁজে বেড়াবে। দল ত্যাগ কর-বার শাস্তি সুমিত্রাকে পেতে হবে। কিন্তু না। মরতে সে রাজী নয়। সে নতুন জীবন শুরু করবে। সে কলকাতা ছেড়ে চলে যাবে। অনেক দূর চলে যাবে। পশ্চিম ভারতের কোনো অখ্যাত গ্রামে গিয়ে সে আশ্রয় নেবে। সামান্য একটা স্কুলে ছেলে মেয়ে পড়াবে। শুরু হবে নতুন জীবন, তখন যদি এ ছেলেটির মানে সৌরভের সে সন্ধান করে। পাবে না এর খোঁজ।

ছেলেটির নাম সে জেনে নিয়েছে। সুন্দর নাম। নাম হলো 'সৌরভ' 'সৌরভ'। বার কয়েক মনের ভেতর নামটি উচ্চারিত হয়। শান্ত ধীর স্থির, নম্র, বিনয়ী, বলিষ্ঠ এ যুবকটিকে ভীষণভাবে সুমিত্রা পছন্দ করে ফেলেছে। সুমিত্রা এক ফাঁকে এও জেনে নিয়েছে কোথায় যুবকটি শিক্ষক হয়ে ছাত্রদের শিক্ষা বিতরণে ব্যস্ত থাকে প্রতিদিন। আজ

সুমিত্রা চলে যাচ্ছে কিন্তু একদিন সে সৌরভের কাছে ফিরে আসবে। সৌরভ অনেকবার সুমিত্রার পরিচয় জানতে চেয়েছিলো। প্রতিবারই সুমিত্রা প্রশ্ন এড়িয়ে গেছে। কি পরিচয় সে দেবে। পরিচয় দেবার আছে কি তার। একটা খুনী, দলত্যাগী, গুণ্ডা দ্বারা লাঞ্ছিতার আবার পরিচয় দেবার কি আছে। ধুলো উড়িয়ে একটা বাস এগিয়ে আসছে। ওরা দু'জন সুমিত্রা আর সৌরভ একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাস মিনিট পাঁচেক এখানে দাঁড়াবে। তারপর ছুটবে রাউরকেল্লা অভিমুখে। আর সৌরভ ফিরে যাবে তার নিজের আস্তানায়। বাসে ওঠার পূর্ব মুহূর্তে সুমিত্রা সৌরভের হাতটা চেপে ধরে। দু'জনের দেহে শিহরণ খেলে যায়। সৌরভ জানে না সুমিত্রার সঙ্গে আর আদৌ দেখা হবে কিনা। সুমিত্রার মনের মধ্যে আশা আবার কোনোদিন সে ফিরে আসবে সৌরভের কাছে।

বাস স্টার্ট দিয়েছে। সৌরভ পাশের একটি লোকের কাছ থেকে একটা ফাউন্টেন পেন আর একখণ্ড কাগজ ধার করে খসখস করে কি যেন লিখলো। লিখে সে কাগজখণ্ড সুমিত্রার দিকে এগিয়ে দিলো।

বাস ছেড়ে দিয়েছে। বাস বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। সৌরভ হাত নাড়ছে। সুমিত্রা বাস থেকে ঝুঁকে সৌরভকে দেখতে চেষ্টা করছে। সেও হাত নাড়ছে। তার চোখের কোণে জল চিকচিক করে ওঠে।

বাস আরো অনেকটা এগিয়ে গেছে। সড়কের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে সৌরভ। নিশ্চল। সুমিত্রা নিজের জায়গায় ঠিকঠাক হয়ে বসলো। লেখাটার ওপর সে চোখ বোলায়। একবার। দু'বার। তিনবার। চারবার। সমস্ত পৃথিবীটা তার চোখের সামনে বনবন করে ঘুরছে।

আরো কয়েকবার সে অক্ষরগুলো পড়ে। সব কেমন যেন ঝাপসা হয়ে আসছে। অস্পষ্ট। সব অস্পষ্ট। না ভুল হবার কোনো কারণ নেই। কলকাতার সেই বাড়ীর নম্বর। সেই গলি। ঠিকানা সম্পূর্ণ মিলে যাচ্ছে। বাবার নাম এক। সুমিত্রার বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধে হয় না। সৌরভ আর কেউ নয়। অরুণাংশুর ছোটো ভাই। অরুণাংশুর ঠিকানা সুমিত্রা

ভুবনেশ্বরে থাকতে সংগ্রহ করেছিলো। যে অরুণাংশুকে সে স্বহস্তে খুন করেছে। হে ভগবান! সুমিত্রার মুখ থেকে একটা ক্ষীণ চিৎকার বের হয়। ভগবান এভাবেই প্রতিশোধ নিলেন। মৃত অরুণাংশুর ভাই এ সৌরভ। আর অরুণাংশুকে খুন করেছে সুমিত্রা। সুমিত্রার দু'চোখ জলে ভরে উঠেছে। এ গল্প আমাকে শুনিয়েছিলো রামজীবন হোতা।

## ৯

চারদিকে আদিম অরণ্যভূমি। আর তারই ভেতর উদয়গিরি আর খণ্ড-গিরি। পাহাড়ের ভেতর গুহা আর গুহা। সেখানেই ভৈরবীকে দেখে-ছিলাম।

মঙ্গোলিয়ান ধাঁচে মুখ। কণ্ঠে হস্তে রুদ্রাক্ষের মালা। এক হাতে কমণ্ডলু। আর অন্য হাতে শিঙা। ওখানেই দেখেছিলাম ছিন্ন-ভিন্ন তালি মারা কম্বলের জামা পরিধানে, মাথায় চাঁদি টুপি জনকে। ওর সম্বন্ধে আমরা আগেই জেনেছিলাম। জন সাহেব বিশ্ব পরিক্রমা করে। তুষারে, পাহাড়ে অরণ্যে, গিরিখাদে নির্ঝরিণীতে ঘুরে বেড়ায়। এদের শিরা-উপশিরায় রক্ত কণিকায় তন্ত্রে তন্ত্রে শ্বাস প্রশ্বাসে বিশ্বপরিক্রমার জীবাণু। আগুনের ভয়াল লেলিহান শিখা। ভগ্নস্তূপের নিচে গনগনে আগুন। কুণ্ডুলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে। পোড়া রবারের গন্ধ।

—আয় ঘুম। আয় ঘুম। বলছে ভৈরবী। জন পা টান টান করে পড়ে আছে।

—আকাশে সূর্য জ্বলছে। আয় ঘুম। আয় ঘুম। অন্ধকার আকাশে তারারা মিটমিট করে জ্বলছে। আয় ঘুম। আয় ঘুম। ভৈরবীর কণ্ঠ থেকে অনবরত বের হচ্ছে শব্দগুলো। ভৈরবী বলছে—'আমি রিটা। আমি রিটা। হ্যাঁ, আমি রিটা।' জনের হাত ছুটো অসহায় অবস্থায় ভৈরবীর দেহে পাক খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি আদর। কি আদর। ভৈরবী বলছে—'হ্যাঁ আমিই রিটা। আমার মধ্যে রিটাকে দেখতে পাচ্ছ কিনা। জনের কেমন যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা। চোখ খোলবার প্রচেষ্টা বার বার বিফল হচ্ছে। মুখ দিয়ে গাঁজলা বেরুচ্ছে। মুখ দিয়ে যন্ত্রণাসূচক আঁ আঁ ধ্বনি। ভৈরবী বলছে—জলে স্থলে অন্তরীক্ষে' দেবদেবী দানবকে সাক্ষী রেখে বলছি।

—মনে পড়ে রিটাকে ? ওই হাত দুটো দিয়ে রিটার গলা টিপে ধরেছিলে। শ্বাসরোধ করে যাকে আল্পসের ওপর থেকে ফেলে দিয়েছিলে। মনে পড়ে সেই রিটাকে ? অতল গর্ভে দেহটা অদৃশ্য হয়েছিলো। মনে পড়ে ? বরফে ঢেকে গিয়েছিলো সেই দেহ। মনে পড়ে সে দেহের কথা? জনের কণ্ঠ থেকে বেরুচ্ছে আর্তস্বর। গোঙ্গাচ্ছে জন। তার মুখ দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছে। ওর হাতের আঙুলগুলো ভৈরবীর গলা লক্ষ্য করে এগিয়ে আসে। কিন্তু ওই পর্যন্ত। থেমে যায় গলার কাছাকাছি এসে। আর এগুতে পারে না। আঙ্গুলগুলো স্থির হয়ে কাঁপতে থাকে। গলা স্পর্শ করার বৃথা প্রয়াস।

—আয় ঘুম। আয় ঘুম। ভৈরবীর কণ্ঠে একটানা সুর। আর জনের হাতের আঙ্গুলগুলো ভৈরবীর সারা অঙ্গে খেলা করে বেড়ায়। কি আদর। কি আদর। 'মণিকাকে কি তুমি এখনো ভালবাসো ? আবার জনের কণ্ঠ থেকে আঁ আঁ করে গোঙ্গানীসুচক শব্দ বেরোয়।

—কি অনায়াসেই না তার মদের ভেতর বিষ মিশিয়ে দিলে। যন্ত্রণায় গোঙ্গায় জন। তার পূর্ব স্মৃতি কি ফিরে আসছে ? পাথরের চাঁই-এর আড়ালে আত্মগোপন করে অরণ্যভূমির ঘনায়মান অন্ধকারের ভেতর নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে ভৈরবীর সম্মোহন বিদ্যার প্রয়োগ দেখে আমি বিস্মৃত বিমূঢ়। সব চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে। আমার সঙ্গে রয়েছে জটাধর পাণ্ডা। জনের প্রতিবাদ করবার শক্তি নেই। ভৈরবীর সম্মোহন বিদ্যার কাছে জন নিতান্তই অসহায়। দুষ্টু শিশু যেন হাত পা ছুঁড়ছে।

—বাগানের ভেতর কবর খুঁড়ে অনায়াসে তার দেহটা তুমি মাটি চাপা দিলে। আত্মসাৎ করলে তার হীরের গয়নাগাটি। কি নির্মম তোমার ভালবাসা। ভৈরবী একটি পাত্র থেকে চুমুক দিয়ে কি যেন গিলছে। পান করাচ্ছে জনকে। জন সাহেব ঝিমুচ্ছে।

এর খানিকক্ষণ পরে দৃশ্যের পরিবর্তন। সম্মোহন বিদ্যায় পারদর্শিনীর এ কি সজ্জা। ক্ষণে ক্ষণে রূপের পরিবর্তন। চরণে তার রাঙা আলতা। দেহে জড়ানো রাঙা চেলী। কপালে চন্দনের ফোঁটা। জটাধর পাণ্ডা

ার আমি বাহ্যজ্ঞান রহিত। সামনে থেকে একে একে সব কিছু উবে
চ্ছে। অরণ্য, মন্দির, দেবদেউল, কৃষ্টি, সংস্কৃতি সব কিছু। দেউলের
ভতর মশালের আলো জ্বলছে। ইঁটগুলো পুড়ে কালচে। ভৈরবীর ঢেউ
তোলা শরীর। গলায় পুঁতির মালা। দেহটাতে কেউ যেন আগুন
ালিয়ে দিয়েছে। নাচছে আর নাচছে ভৈরবী। রূপপসারীনী নাকি?
ন ভৈরবীর দিকে অপলক মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সে উত্থান-
ক্তি রহিত। কামনা জ্বালায় কি জর্জরিত হচ্ছে জন?
লসার রঙ ধরেছে তার ত্বচোখে। ভৈরবী নেচে চলেছে। তার দেহ
থেকে বসন এক এক করে খুলে পড়ছে। একি জলসাঘরের নৃত্য? ভৈরবীর
াতে পানের ছোপ। নাকে রূপোর নাকছাবি। এই উদয়গিরি আর
ণ্ডগিরির গুহাগুলোতে তু হাজার বছর আগে অরণ্যের নির্জনতার
ভতর ধ্যানরত অবস্থায় থাকতো জৈন সাধুরা। রাণীগুম্ফে রয়েছে চমক-
দ শিলালিপি। হাতিগুম্ফের দেয়ালে লেখা রয়েছে রাজার কীর্তি-
াহিনী। ভৈরবী পাত্রের নিচের তলানিটুকু গলায় ঢেলে বলে—
—আয় ঘুম। আয় ঘুম। যেন মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে ভৈরবীর কণ্ঠ থেকে।
ক্যাথারিনকে নিয়ে আর কতোদিন তোমার খেলা চলবে। বলো।
লো। মশালের আলো জ্বলছে। কুঠুরীর মধ্যে নেচে চলেছে ভৈরবী।
ারদিকে জমাট অন্ধকার। হঠাৎ পাশের ঝোপটা নড়ে উঠলো। আমি
ার পাণ্ডা কিছু আঁচ করবার আগেই একটা মনুষ্যমূর্তি ঝোপের ভেতর
থেকে উঠে এসে গুহার দিকে এগিয়ে গেলো। কে ওই মনুষ্যমূর্তি?
ক? কেন কিসের জন্যে এখানে আগমন? মনুষ্যমূর্তি আরো খানিকটা
াগিয়ে গেলো। আগুনের আলোতে মনুষ্যমূর্তিকে পরিষ্কার দেখা
গেলো। পেছন থেকে দেখে বোঝা গেলো এ এক নারী। কিন্তু কে এই
ারী? এ অসময়ে! এ জঙলা পাহাড়ী জায়গায় কেন তার আগমন?
ারীমূর্তি আরো খানিকটা এগিয়ে গেলো। বুকের ভেতর থেকে কি
ান টেনে বের করলো। তারপর মূহূর্তে গুলির আওয়াজ। একবার।
বার। তিনবার। আগুনের ঝিলিক। খানিকটা ধোঁয়া। পিস্তলের

শব্দ। নারীকণ্ঠের যন্ত্রণাসূচক চিৎকার। ভৈরবী বুক চেপে ধরে মাটি
লুটিয়ে পড়লো। নারীমূর্তি ধীর পদক্ষেপে স্থান ত্যাগ করলো। ক্যাথারিনে
মুখখানা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম। নির্মম প্রতিশোধ নিয়েছে ক্যাথারিন
প্রেমের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী রাখতে নেই।

পরদিন ধৌলিপ্রান্তরে আশোকের হাতিগুম্ফার পাশে দুটি প্রাণহী
দেহ পড়েছিলো। একটি দেহ জনের। দ্বিতীয়টি ক্যাথারিনের। দুজ
জড়াজড়ি করে পড়ে আছে। আত্মহত্যা করেছে দুজন। চুক্তিবদ্ধ মৃত্যু
ক্যাথারিন জনকে পিস্তলের গুলিতে মেরে নিজেও পিস্তলের গুলি
মরেছিলো। এ গল্প আমাকে শুনিয়েছিলো নির্মল মহাপাত্র।

১০

লিঙ্গ নগরীর দুর্গ শিশুপালগড়ে আজ বিরাট উৎসব। সারা দুর্গের সিন্দারা আজ বিজয় উৎসবে মেতে উঠেছে।
ত্যগীত আমোদ আহ্লাদে সারাটা নগরী আজ মুখরিত। হর্মপ্রাকারে চীরে নিশান উড়ছে। প্রহরারত প্রহরীদের কর্মে মনোনিবেশ করবার ময় নেই। সুরাপানে অনেকেই অচৈতন্য। দুর্গে উৎসবের কারণ মগধ-হিনী আজ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। মগধ নৃপতি আজ সম্পূর্ণ পরাজিত। শোকের কলিঙ্গ বিজয়ের পূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে কলিঙ্গ নৃপতি দান্ত পরাক্রমশালী খারভেলা। এরচেয়ে সুখবর আর কি হতে পারে। লিঙ্গের জিন মূর্তি রাজা নন্দ কর্তৃক অপহৃত হয়েছিলো। পুনরায় তা রভেলার হস্তগত হয়েছে। খারভেলার বিজয়বাহিনী তাণ্ডব নৃত্যে তেছে। উত্তর, পশ্চিম, উত্তর মধ্য ভারতে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে খারভেলা। ষ্ট্রীকস্, ভোজকস্ পরাজিত। গোরাধাগিরি জ্বলছে। সবকিছু প্রজ্বলিত। জগৃহ লুণ্ঠিত। উত্তরপথের সমস্ত নৃপতিরা কম্পিত। আসিক নগরী দদলিত, বিদ্যাধর নৃপতি পর্যুদস্ত। গঙ্গা পার হয়ে পাটলিপুত্রের ওপর পিয়ে পড়েছিলো খারভেলা। তাই শিশুপালগড়ে বিজয় উৎসবে তে উঠেছে সারা নগরীর অধিবাসীরা। তারা নৃত্য গীতে মেতেছে। হরারত প্রহরীরা অনেকেই হুঁশ চৈতন্য হারিয়েছে। সুরাপানের াধিক্যে অনেকেরই চোখ ঢুলু ঢুলু।
শুপালগড়ে যখন আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে তখন সবাইকার অলক্ষ্যে রুষের বেশে অশ্বারূঢ় হয়ে বেরিয়ে পড়লো খারভেলার প্রধান মহিষী। দেহ তার মৃগচর্মে আচ্ছাদিত। কটিতে তরবারি। কোমরে গুপ্ত ছুরিকা। দেশে ঢাল। রণসাজে সজ্জিতা নারী। অশ্বপৃষ্ঠে একের পর এক

হর্ম্যরাজি অতিক্রম করলো মহিষী। পার হলো কতো উদ্যান। নির্ম
জলের তড়াগ পার হয়ে নগরের প্রাচীরের কাছে পেঁাছে গেলো প্রধা
মহিষী। সাঙ্কেতিক ধ্বনিতে সচকিত হল দ্বাররক্ষীরা। প্রাকারে
লৌহদ্বার উন্মুক্ত হলো। দ্বারদেশে প্রহরীরা নতজানু হয়ে খারবেলা
প্রধান মহিষীকে অভিবাদন জানালো। যে কোনো সময় দুর্গ প্রাকারে
বাইরে যাবার অনুমতি রয়েছে মাত্র জনা কয়েকের। তার মধ্যে একজ
হল রাজমহিষী। প্রাচীরের চারদিকে ঘেরা পরিখা। পরিখার ভেত
দিয়ে জলরাশি প্রবাহিত। পরিখার ওপর ত্বরিৎ গতিতে কাঠের পাটাত
নেমে এলো। পরিখার দুই প্রান্তের সঙ্গে সংযোগ সাধন করলে কাঠে
পাটাতন। কাঠের পাটাতনের ওপর দিয়ে অশ্ব দুর্বার গতিতে ছুটে পরি
পার হলো। লৌহদ্বার সশব্দে বন্ধ হলো। তারপর থেকেই দুর্বার গতি
ধাবমান অশ্ব পৃষ্ঠে পুরুষ বেশে বসে রয়েছে খারবেলার প্রধান মহিষী
শিশুপালগড় দুর্গের তিনমাইল দক্ষিণে ধৌলি পাহাড়। আর শিশুপা
দুর্গের উত্তর পশ্চিমে ছমাইল দূরে খণ্ডগিরি আর উদয়গিরি পাহাড়
রাজমহিষীর গন্তব্যস্থল।

অপরাহ্নকাল। ধৌলিপাহাড়ের কাছে পেঁাছে অশ্ববল্গা সংযত করে অশ্বে
গতি হ্রাস করে রাজমহিষী। নামিয়ে আনে মস্তকের উষ্ণীষ। ভেত
থেকে কেশদাম বেরিয়ে এসে হাওয়ায় কিছু কিছু অলকদাম উড়তে থাকে
কপোল দেশের ঘাম মুছে ফেলে মহিষী। তারপর তির্যক দৃষ্টি হা
ধৌলিপাহাড়ের দিকে। ঠোঁটের কোণে ফুটে ওঠে অবজ্ঞার হাসি। ও
ধৌলিপাহাড়ে রয়েছে অশোকের শিলালিপি। তার যশ কীর্তির সা
বহন করছে। এই প্রান্তরে পরাজিত হয়েছিলো কলিঙ্গ-বাহিনী। র
হুঙ্কারে প্রান্তর হয়েছিলো মুখরিত। বেজে উঠেছিলো রণদামামা
আহতদের করুণ ক্রন্দন আর বন্দীদের পদশৃঙ্খলের শব্দ ভেসে বেড়াচ্ছিলো
সারা প্রান্তরে।

মহিষী ভাবে আজ দেড়শো বছরের ভেতর একি পরিবর্তন। ধৌলিপাহা
প্রান্তরে পরাজয়ের উপযুক্ত প্রতিশোধ নিয়েছে খারবেলার বাহিনী

খণ্ডগিরি উদয়গিরি পাহাড় গহ্বরে খোদিত হচ্ছে খারবেলার বীরত্ব-কাহিনী।

অশোকের শিলালিপির অতি নিকটে খণ্ডগিরি উদয়গিরি পাহাড়ে একের পর এক লিপি উৎকীর্ণ হচ্ছে। মাত্র দেড়শো বছরের ভেতর একি অদ্ভুত পরিবর্তন। মহিষীর ঠোঁটের কোণে অবজ্ঞা আর বিদ্রূপ মেশানো হাসি।

অপরাহ্নকাল। শীতল হাওয়া পরশে অঙ্গ শিহরিত পুলকিত হচ্ছে। মহিষী বারবার পদতাড়না করে অশ্বপৃষ্ঠে। অতি সহজে অশ্ব গতিবেগ বর্দ্ধিত করে। লক্ষ্য খণ্ডগিরি উদয়গিরি।

হাতিগুম্ফা শিলালিপি উৎকীর্ণ হচ্ছে খারবেলার আদেশে। আর মঞ্চপুরী শিলালিপি উৎকীর্ণ হচ্ছে রাজমহিষীর আদেশে। কি এক দুর্বার আকর্ষণ রয়েছে ওই উদয়গিরি আর মঞ্চপুরী গিরিগুহায়। গিরিগুহাগুলো যেন চুম্বকের মতো টানছে রাজমহিষীকে। প্রাসাদে বসে শান্তি পাচ্ছিলো না মহিষী। এতো আনন্দ উৎসব চারদিকে। তবু যেন শান্তি নেই মনে। যে শিল্পীর ওপর মঞ্চপুরী শিলালিপি উৎকীর্ণ করবার ভার পড়েছে সে লোকটা কেমন যেন অদ্ভুত ধরনের। অপূর্ব সুন্দর যুবা। উন্মাদ কিনা কে জানে ' প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষের ওই বুঝি লক্ষণ। সে সদা সর্বদা বিশৃঙ্খল পরিবেশে থাকতে ভালবাসে। সাজসজ্জা ভোগবিলাস কোনো কিছুরই ওপর তার কোনো রকম আকর্ষণ নেই। রাজমহিষীকে গুপ্তচর এক গুপ্ত খবর নিবেদন করেছে। আর তাতেই মহিষী হয়ে উঠেছে চঞ্চল অস্থির। শিল্পী নাকি ইদানীং মঞ্চপুরীর কাজ থেকে নিবৃত্ত হয়ে অন্য এক গিরিগুহায় এক নর্তকীর মূর্তি খোদাই করতে ব্যস্ত। দিবাভাগের বেশীর ভাগ সময় সে মঞ্চপুরীর কাজ থেকে অবসর নিয়ে ওই কাজে মেতে থাকে। মহিষীর মনে ঘোরতর সন্দেহ। কে ওই নর্তকী ? মঞ্চপুরীর শিল্পী কেন নর্তকীর মূর্তি গুহার দেয়ালে খোদাই করতে ব্যস্ত ? গুপ্তচর আরো খবর বিবৃত করেছে। শিল্পী নায়িকা নাম্নী এক নর্তকীর সঙ্গে গুপ্ত প্রেমে জড়িত। আজকাল সে ঘনঘন তার কর্তব্য

কর্মে ফাঁকি দিচ্ছে। মহিষীর কাছে এ এক বিরাট অপরাধ। শিল্পীর কর্তব্য থেকে সরে দাঁড়ানো এক অমার্জনীয় অপরাধ। মঞ্চপুরীর শিল্পকর্মে শিল্পীকে নিযুক্ত করা হয়েছে। মহিষীর আদেশ অনুযায়ী কার্য না করে শিল্পী এক নর্তকীর প্রতি অনুগত। মহিষীর অন্তরে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে। শিল্পী কি জানে না রাজমহিষীর প্রতাপ কতোখানি। খারবেলার মহিষীদের ভেতর যে সবচেয়ে বেশী আদরের। যার ক্ষমতা অন্যান্য মহিষীদের চেয়ে অনেক অনেক বেশী। শিল্পী কি জানে না যে খারবেলা রাজ্য প্রশাসনের অনেকটা ক্ষমতা এ মহিষীর ওপর ন্যস্ত করেছে। মহিষী জানতে চায় কার আদেশে শিল্পী উদয়গিরি খণ্ডগিরি গিরিগুহায় এক নর্তকীর মূর্তি উৎকীর্ণ করতে যাচ্ছে। এতোখানি দুঃসাহস তার কোথা থেকে এলো। নির্জন পাহাড়ী পথে অশ্বারোহিণী চলেছে। শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যপথ। এক সময় অশ্ব পৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করে পায়ে পায়ে হেঁটে চলেছে মহিষী। পড়ন্ত বেলা। দুপাশে নিবিড় গাছপালা। বেলাশেষের লাল হলুদ রোদের ঝালর। পাখীরা ডাকে। শঙ্খচূড় ফণা তুলে মাথা আন্দোলিত করে। রাজমহিষীর ভ্রূক্ষেপ নেই। অরণ্যপথে হিংস্র নখর শ্বাপদের সাড়া মেলে ঘন ঘন। রাজমহিষীর ভয়টা কিসের? তূণে রয়েছে তীর। সঙ্গে ধনুর্বাণ। কোষে তরবারি। তাছাড়া মহিষী বর্মে আচ্ছাদিতা।

প্রয়োজন হলে এক তীরে আক্রমণ ইচ্ছুক শার্দুলকে খতম করতে আর কতোক্ষণ সময় লাগবে।

অরণ্যপথে দেখা হয়েছিলো দণ্ড পাশিকের সঙ্গে। ওই পুরুষ নগর-রক্ষীদের ভেতর উচ্চ পদাধিকারী। শিশুপালগড় আর তার আশপাশ অঞ্চলের শান্তিরক্ষায় যার রয়েছে সক্রিয় ভূমিকা। আশেপাশে অরণ্য অঞ্চলে প্রতিহারীর দল ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। রাজমহিষী অরণ্যের ভেতর পথ করে অনায়াসে পাহাড়ের শীর্ষদেশে চলে এসেছে। একের পর এক গুহা পরিদর্শনে মহিষী ব্যস্ত। স্থপতি কোথায়? মঞ্চপুরীতে শিল্পী অনুপস্থিত। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে মহিষী। ক্রোধে উন্মত্ত রাজ-

মহিষী। রাগের জ্বালায় হাতের বংশ কঞ্চি বেঁকিয়ে মট্ করে ভেঙ্গে ফেলে। শেষ পর্যন্ত এক গুহায় শিল্পীর সাক্ষাৎ মেলে। দূতের কথাই ঠিক। শিল্পী তার সাধনা নিয়ে মগ্ন। নির্জন গুহাপ্রাচীরে এক নারীমূর্তি উৎকীর্ণ করতে ব্যস্ত সে।

—শিল্পী, ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে চিৎকার করে ওঠে মহিষী। আচ্ছন্নতা থেকে ঝটিতি সম্বিত ফিরে পায় শিল্পী। সে ঘুরে তাকায় রাজমহিষীর প্রতি।

—শিল্পী। তুমি কি বিস্মিত হয়েছো যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মঞ্চপুরীর আরব্ধ কর্ম তোমাকে সমাপ্ত করতে হবে। চেঁচিয়ে বলে মহিষী।

—না আমি বিস্মিত হই নি। নিম্নকণ্ঠে এবং শান্ত স্বরে জবাব দেয় শিল্পী।

—তবে কোন্ সাহসে নিজেকে অন্য শিল্পকার্যে ব্যাপৃত রেখেছো। প্রশ্ন করে রাজমহিষী।

—শিল্পীর কি বিশ্রাম বা অবসর সময়ে আত্মতুষ্টি বা চিত্তবিনোদনের জন্যে অন্য শিল্পকার্যে আত্মনিয়োগের অধিকার নেই।

—চিত্তবিনোদনের জন্যে কিংবা বিশ্রামসুখের জন্যে কি দুর্গে গেলে চলতো না। তুমি আমার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছো। তুমি জানো দুর্গে খার-ভেলার বিজয় গৌরব উৎসব পালিত হচ্ছে।

—জনঅরণ্যে আমি হারিয়ে যেতে চাই নি। ভোগ উৎসব আমাকে আকর্ষণ করে না। জনকোলাহল আমাকে উন্মাদ করে তোলে। নির্জনতা আমাকে আকর্ষণ করে। আমাকে শান্তি দেয়।

—নির্জনতার জন্যে দুর্গের ভেতর কোনো প্রাসাদকক্ষ কি যথেষ্ট নয়। সেখানে কি শান্তি মেলা অসম্ভব?

শিল্পী নিরুত্তর। সে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

মহিষী বলে—দেখতেই পাচ্ছি কি কারণে নির্জনতার প্রতি তোমার এতো আকর্ষণ। শিল্পসাধনা কোন্ পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছে তা বোঝা আমার পক্ষে মোটেই অসম্ভব কিছু নয়। আমি জানতে পেরেছি এক নর্তকীর ছলকলায় তুমি ভুলেছো। ওই নারীর মূর্তি প্রস্তরে প্রাচীরে উৎকীর্ণ

করে তুমি তাকে বিখ্যাত চিরস্মরণীয় করে তুলতে চাও।

—ওই রমণী নটী নয়। ধীরে ধীরে বলে শিল্পী।

—স্তব্ধ হও। নটী নয়। প্রতারণা থেকে বিরত হও। রমণী শুধু নটী নয়। সে বারবণিতা। ক্রোধে রাজমহিষী বুঝি উন্মাদ হয়ে গেছে।

—আপনি রাজমহিষী। আপনার মুখে এ সব কথা শোভা পায় না। শিল্পী সংযত কণ্ঠে বলে।

—তোমার উপদেশ শুনতে আমি এখানে আসি নি। তোমার এই ঔদ্ধত্য অমার্জনীয়। তুমি রাজমহিষীর আদেশ ভঙ্গ করেছো। মঞ্জুপুরীর প্রাচীর কার্য থেকে বিরত থেকে এক বারবণিতার মনস্তুষ্টিতে মেতেছো। ছিঃ ছিঃ।

—আপনি রাজমহিষী। আপনার সম্পদ আছে। আপনার বৈভব আছে। আপনার ক্ষমতা রয়েছে। আপনার বলবার অধিকার রয়েছে। আমি এক নগণ্য শিল্পী। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আপনার এসব বক্তব্য রাজবংশের মর্যাদার ওপর কালিমা লেপন করবে।

মহিষী বলে—'নৃপতি খারভেলার বিজয় উৎসবে যখন সারা নগরী মেতেছে শিল্পীকে তখন দুর্গে আসার জন্যে নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো। তুমি নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছো। এ স্বেচ্ছাচারিতা রাজদ্রোহিতার সমতুল্য। আমার আদেশ অমান্য করবার স্পর্ধা তুমি কি করে পেলে। জানো এর দণ্ড কি। দণ্ড হল দীর্ঘদিনের কারাবাস।

ওই বারবণিতা তোমাকে ধ্বংসের মুখে টেনে নিয়ে চলেছে। যুবক এখনো তুমি নিজেকে সংযত করতে পারো।

—আপনি নারী। আপনি আর এক নারীকে কলঙ্কে কলঙ্কিত করবেন না।

এদিকে মহিষী অন্তরের সঙ্গে আর কতক্ষণ যুদ্ধ চালাবে। প্রতিটি রক্ত কণিকা যেন এক একটি অগ্নিবিন্দু। মনের গভীর গহনে কি একটা যেন পাক খেয়ে খেয়ে বেড়াচ্ছে। মনের অলিন্দে অলিন্দে একটা সচল আগ্রহ ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে।

শিরায় শিরায় রক্তের ঝলকানি। বুকের ভেতর আগুন জ্বলছে। কখন নির্বাপিত হবে অগ্নিশিখা। কে জানে। একটি মানবপুত্র সে আগুন নেভাতে পারে। আর সে মানবপুত্র এতো নিকটে। এতো নিকটে থেকেও এতো দূরে। মানব-পুত্রের ভেতরে রয়েছে এক হীরক-দীপ্তি। জন্মান্তর রহস্য ভেদ করলে সন্ধান পাওয়া যাবে এ মানুষটি তার অতি নিকটের। তার অতি পরিচিত।

হঠাৎ রাজমহিষীর কণ্ঠস্বর অনেক শীতল অনেক শান্ত হয়ে আসে। কণ্ঠস্বর নেমে এসেছে অনেক নিচু পর্দায়।

—শিল্পী তুমি কি এক ললনাকে হৃদয় থেকে মুছে ফেলতে পারো না?

শিল্পী নিরুত্তর।

—তুমি ওই সামান্য নারীকে অন্তর থেকে সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলো। এই হল খারভেলার প্রধান মহিষীর আদেশ। তুমি ভালো করেই জানো আমার প্রভাপ-প্রতিপত্তি কতোখানি। খারভেলা, ঐশ্বর্য বৈভবে যার সমকক্ষ ভূ-ভারতে নেই। রণকুশলতায় যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। হ্যাঁ। আমি সেই বীরের স্ত্রী। রূপ গুণে যার সমকক্ষ নারী তুমি সারা কলিঙ্গে খুঁজে পাবে না। খারভেলা ক্ষেমরাজা। শৃঙ্খলা শান্তির সজাগ প্রহরী। বাড় রাজা। ঐশ্বর্যের একমাত্র প্রতীক। ইন্দ রাজা—সমস্ত রাজগুণসম্পন্ন।

শিল্পী বলে—নৃপতির সমস্ত গুণাবলী সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণভাবে অবগত আছি।'

—শিল্পী তুমি একবার আমার দিকে তাকিয়ে দেখ। আমার রূপ রয়েছে। গুণ রয়েছে। আমি নৃত্যগীতে পারদর্শিনী। নৃত্যগীত যন্ত্র-সঙ্গীতের চৌষট্টি কলাবিভাগে পারদর্শিনী। খারভেলার পরিকল্পিত তৌর্যট্রিকা বা এই চৌষট্টি কলাবিদ্যার সফল রূপায়ণ আমার সাহায্য ছাড়া কখনোই সফল হতো না। খারভেলা বিদেশে যুদ্ধরত। শিশুপালগড় দুর্গের সমস্ত ভার আমার ওপর ন্যস্ত।

—আমার কিছুই অজানা নয়। মৃদুস্বরে বলে শিল্পী।

—আমার একটি অনুরোধ। তুমি ওই সামান্য নারীকে ভুলে যাও। আর

তা বলবার জন্যে আমি নিজে অশ্ব ছুটিয়ে এসেছি।
—রাজআজ্ঞা রাজদূত বহন করে নিয়ে এলেই বোধ করি বেশী লোভনীয় হতো।
—শিল্পী তোমার জন্যে রাজদূত নয়। তোমার জন্যে স্বয়ং রাজমহিষী ছুটে এসেছে। তুমি তার অনুরোধ পদদলিত করো না।
—কিন্তু এ আদেশ অন্যায়। এ শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনের ওপর হস্তক্ষেপ। আমার পক্ষে এ আদেশ মান্য করা কখনো সম্ভব নয়। প্রায় চিৎকার করে শিল্পী বলে ওঠে।
—না। না। এ আমার সামান্য অনুরোধ। মহিষী এগিয়ে এসে শিল্পীর হাত দুখানা নিজের হাতের ভেতর টেনে নেয়। একটু হেসে মহিষী বলে—ভালো করে চেয়ে দেখ তোমার দ্বারে কে উপস্থিত হয়েছে। তোমার কাছে এসেছে রাজমহিষী চম্পাবতী। বাজীরা ঘরা নৃপতি হস্তিসিংহ দুহিতা তোমার সম্মুখে উপস্থিত। রাজমহিষীকে তুমি করুণা করো। আমি কতো দূর থেকে এখানে তোমার জন্যে ছুটে এসেছি। তুমি একবার ভেবে দেখ।
—কিন্তু কেন? কেন এ আসা?
—এখনো তুমি জানতে চাও না। বুঝতে চাও না। হে রাজোচিত সুলক্ষণ যুক্ত পুরুষ। তোমার মুখশ্রী আমি বার বার স্বপ্নের মধ্যে দেখতে পাই। তোমার তনুশ্রী আমার অন্তরে ঝড়ের মাতন তোলে। সব কি তোমার অজানা। আর কতক্ষণ অপেক্ষা করা যায়। কামনার এ জ্বালা অসহ্য। একদিকে মহিষী জ্বলছে পুড়ছে। অন্যদিকে যুবা শিল্পী হিমশীতল। মহিষীর মনে দাবানল। অন্যদিকে শিল্পীর মনে হিমপ্রবাহ। মহিষী আর অপেক্ষা করতে পারে না। আজ এই বিজয়োৎসবের দিনে চূড়ান্ত মীমাংসা করবার জন্যে মহিষী উন্মুখ। ব্যগ্র। মহিষী অতর্কিত ঝাঁপিয়ে পড়লো শিল্পীর বুকে। হতভম্ব হতবাক শিল্পী চেষ্টা করেছিলো বাঘিনীর কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে। এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়েছিলো মহিষীকে। খানিকটা দূরে সরে গিয়ে আবার ছুটে মহিষী শিল্পীকে তার পেছন

দিক থেকে জড়িয়ে ধরেছিলো। বুঝিবা নিজের বুকের উষ্ণতা দিয়ে শিল্পীকে উষ্ণ করে তুলতে চেয়েছিলো। শিল্পীর সারা কাঁধে পিঠে নিজের ঠোঁট ঘষতে শুরু করেছিলো। চুম্বনে চুম্বনে অস্থির করে তুলেছিলো শিল্পীকে। কিন্তু শিল্পী অকম্পিত। সংযমের বাঁধ সে ভাঙ্গতে দেয়নি। সে বরং ভীত। সন্ত্রস্ত। এ অসম্ভব। প্রবল পরাক্রমশালী খারভেলা। যার তুল্য বীর ভূভারতে আর নেই। তার প্রধান মহিষীকে উপভোগ করা। অসম্ভব। অসম্ভব। এ হতে পারে না। এ হওয়া উচিত নয়। শিল্পীর বর্তমান রয়ছে। ভবিষ্যৎ রয়েছে। এ তার চিন্তার বাইরে। শিল্পী মহিষীকে তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চাইল। কিন্তু মহিষী তাকে জড়িয়ে ধরে রয়েছে। মহিষীর করুণ ক্রন্দন।—আমি তোমার প্রেমপ্রার্থী। আমার সমস্ত ক্লান্তি শ্রান্তি তুমি দূর কর। আমি তোমার। আমি তোমারই। পাশের কুঠুরীতে এ মুহূর্তে জেগে উঠলো পদধ্বনি। কঙ্কণের রিনিঝিনি। মহিষী চমকিত। বিস্মিত। শিল্পীও কম চমকিত নয়। শিল্পী তার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে মহিষীকে তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে সরিয়ে দিতে চায়। শারীরিক শক্তি বোধকরি প্রবলই হয়ে গিয়েছিল। মহিষী ছিটকে গিয়ে মেঝের ওপর গড়িয়ে পড়ল। পাথরের মেঝেতে মস্তক ঠুকে গিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। উপেক্ষিতা মহিষী অপমানে জর্জরিত হয়ে অতর্কিতে চিৎকার করে উঠলো। গগনভেদী সে চিৎকার।—কাপুরুষ। কামপ্রবণ পশু। রাজমহিষীর অঙ্গ পরশের সমুচিত প্রতিফল তুমি এক্ষুনি পাবে। খারভেলার মহিষী কখনো এ অপমান সহ্য করবে না। কামজ্বালায় জর্জবিত পশু তোমাকে আমি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলাম। মহিষীর চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে প্রতি-হারীর দল এদিক-ওদিক থেকে ছুটে আসে। কিন্তু তার পূর্বেই মহিষী প্রস্তরের ওপর খোদাই করা নারীমূর্তিকে বারবার ছুরিকাবিদ্ধ করে বিকৃত বীভৎস করে তুলেছে। পাশের গুহাতে কিন্তু তখনো মাঝে মাঝে কঙ্কন মৃদু আওয়াজ তুলছে।

এর পরের ঘটনা। শিল্পীর ছুরিকাবিদ্ধ রক্তাক্ত দেহটা যখন উদয়গিরি পাহাড়ের নিচে পোষা হাতির পদতলে নিষ্পেষিত হচ্ছে—তখন মহিষীর অশ্ব তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে শিশুপালগড়ের উদ্দেশ্যে। শিশুপালগড়ে বিজয় উৎসব শেষ হবার আগেই মহিষীকে সেখানে পৌঁছতে হবে। মঞ্চপুরীর শিল্পকার্য ন্যস্ত হবে অন্য এক স্থপতির ওপর। নর্তকী নায়িকাকে দেশ থেকে নির্বাসিত করতে হবে। আজ রাতটা কাটুক। কোথায় খারভেলার মহিষী আর কোথায় তুচ্ছ নর্তকী নায়িকা। কি দেখে শিল্পী ভুলেছিলো। শিল্পী হয়তো উন্মাদই ছিল। যাক্ খুব বেঁচে গেলো মহিষী, কি ভুলটাই সে করতে যাচ্ছিলো। কোথা থেকে কোথায় সে নেমে যাচ্ছিল। এ অমার্জনীয় এক অপরাধ।

## ১১

যে টিলার ওপর এই বাংলো তার সামনের ঢালু জমিতে নদীখাত। তার ওপরে পাহাড়ের খাড়াই থেকে ফিনকি দিয়ে জলের অজস্র ছড় নামছে। অজগরের দেহের মতো পাক খেতে খেতে জঙ্গলের ভেতর কাঁচা পথটা অদৃশ্য হয়েছে। মেঘলা আকাশ ছায়া ফেলেছে ওই বাংলোর বারান্দায়। বাতাসে বৃষ্টির গুঁড়ো। মৃগনাভির সুবাসে বাতাস ভারী। পাহাড়তলীর গ্রামটাকে ঠিক গ্রাম বলা যায় না। বৃক্ষের ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটা করে ঘর। রাত্রি নিশীথে বাঘ ঘুরে বেড়ায়। হাওয়ায় কুয়াশা ভাসে। নদী-পথে অজস্র কাঠের টুকরো ভেসে যায়।

এ পশ্চিম উড়িষ্যার কালাহাণ্ডির অরণ্য। অরণ্যের অনেকটা অভ্যন্তরে আমরা রয়েছি। চারদিকে আবছা আলোর জাল। কাঠগোলাপের গন্ধ। থেকে থেকে অরণ্যের স্বর শুনতে পাই। আমার পরিচর্যার জন্যে যে লোকটি নিযুক্ত হয়েছিল তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—তোমার দেশ কোথায়? সে বলেছিল পশ্চিম উড়িষ্যায় বরপলি অঞ্চলে। প্রশ্ন করে-ছিলাম—তোমার বাবার নাম কি? সে উত্তর দিয়েছিল—অন্তর্যামী বসনচোর। একটা ধাক্কা খেলাম। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে উঠল। এ কি সেই অন্তর্যামী বসনচোর যার সম্বলপুর জেলে ফাঁসী হয়েছিল। আমি সোজাসুজি প্রশ্ন করি—তোমার বাবার কি ফাঁসী হয়েছিলো? ও মাথা নেড়ে আমার কথার সমর্থন করে। বেশ মনে আছে সম্বলপুরে ইনস্‌পেকসান বাংলোতে বসে আছি। সঙ্গে রয়েছে ওখানকার জেলার সাহেব। কথায় কথায় জেলার সাহেব বললো—পরশু অন্তর্যামীর ফাঁসী হবে।' মনটা বড্ডো খারাপ হয়ে গেল। মাঝে মাঝেই জেলার সাহেবের সঙ্গে জেলের ভেতর যেতাম। আর জেলের ভেতরই ওর সঙ্গে আলাপ। জানতাম ও হত্যা করেছে আর তাতেই ওর মৃত্যুদণ্ড

হয়েছে। অন্তর্যামীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমার ওকে ভালোই লেগে-ছিল। আর ওরও বোধ হয় আমাকে ভালো লেগেছিল না হলে পুরো হত্যাকাণ্ডের কাহিনী আমাকে শোনাবে কেন? আমি লেখক মানুষ। গল্পের প্লটের সন্ধানে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াই। প্লটের সন্ধানে তাই সারাটা উড়িষ্যা চক্কর খেয়ে বেড়িয়েছি। যে উড়িষ্যাকে জানতাম না তাকে জেনেছি। শ্রদ্ধা ভক্তিতে আপ্লুত হয়েছি। এখানকার নৃত্য, গীত, শিল্পকলা, ভাস্কর্য আমাকে বিমুগ্ধ করেছে। ভুবনেশ্বর, কোণারক আর পুরী যাকে Golden Triangle বলে তা আমার মতো ট্যুরিষ্টকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করেছে। উড়িষ্যার রাজধানী ভুবনেশ্বর থেকে ৬৫ কিলোমিটার দূরে সূর্যমন্দির কোণারক স্থাপত্যবিদ্যার এক অপূর্ব নিদর্শন। ভুবনেশ্বরে নাকি এক সময় ৭,০০০ মন্দির ছিল। পুরীর বিখ্যাত সমুদ্র সৈকত আমার বড্ডো ভালো লেগেছে। আর ওখানেই রয়েছে ভারতখ্যাত জগন্নাথ দেবের মন্দির।

অন্তর্যামী বসনচোর তার হত্যাকাহিনী আমাকে বলেছিল। আমার হাত দুটো ধরে বলেছিল তার হারিয়ে যাওয়া ছেলেটার খোঁজখবর করতে। কোনো এক সময় জমি জমা নিয়ে অন্তর্যামীর সঙ্গে তার প্রতিপক্ষের খুব গোলমাল চলছিল। কোনো এক সন্ধ্যায় প্রতিপক্ষের তিনটি লোক অন্তর্যামীকে ঘিরে ফেলেছিলো। অন্তর্যামী মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে-ছিলো। সেই সময় একটি ছেলে কোথা থেকে অতর্কিতে এসে ঐ গুণ্ডা-গুলোর ওপর অমিত বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে আক্রমণ ঠেকাতে ব্যর্থ হয়ে ভাড়া করা গুণ্ডাগুলো পালিয়ে যায়। বেঁচে যায় অন্তর্যামী। ছেলে-টিকে বুকে জড়িয়ে ধরলো অন্তর্যামী। নিয়ে এলো নিজের ঘরে। আর তারপর থেকেই অন্তর্যামীর ঘরে ছেলেটি ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করলো। অন্তর্যামীব একটি মেয়ের সঙ্গে ছেলেটির হল প্রেম। অন্তর্যামীর স্ত্রীর পচ্ছন্দ নয়। অন্তর্যামী চোখ বুজে থাকে। দেখেও কিছু দেখে না। মনে মনে ভাবে ওদের বিয়ে দিয়ে দেবে। এর পর মেয়েটি হল অন্তঃস্বত্বা। ছেলেটি অকস্মাৎ একদিন উধাও হলো। সারা গ্রাম, আশেপাশের

গ্রামে পাত্তা মিললো না ছেলেটির। গ্রামে ইতিমধ্যে কথাবার্তা শুরু হয়ে গেছে। অন্তর্যামী ঠিক করলো মেয়েকে হত্যা করে মহানদীর জলে ভাসিয়ে দেবে। গভীর রাতে দা নিয়ে সে ঢুকলো মেয়ের ঘরে। সর্বাঙ্গে কাঁথা মুড়ি দিয়ে মেয়ে ঘুমোচ্ছিলো।

অন্তর্যামী দা চালালে। টুঁ শব্দ করবার আগেই ধড় থেকে মাথা আলাদা হলো। কিন্তু সে বিছানায় মেয়ে ছিল না। ছিল অন্তর্যামীর সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে যে প্রিয়—সেই ছোট ছেলে। অন্তর্যামীর স্ত্রীর শরীরটা ভালো ছিল না। গভীর রাতে তাকে শুশ্রূষা করতে মেয়ে উঠে গিয়েছিলো। আর ছেলে এসে সে শয্যায় শুয়েছিলো। কাঁথা সরাতেই সমস্ত ব্যাপারটা স্পষ্ট হল অন্তর্যামীর কাছে। অন্তর্যামী পাগলই হয়ে গেল। পুলিশের কাছে সে ধরা দিলে। স্বীকার করলো সমস্ত কিছু।

কালাহাণ্ডি অরণ্যের বাংলোতে বসে ভাবছিলুম। আর ভাবছিলুম। কতো অভিজ্ঞতাই তো হলো। কোণারক দেখে গেলুম পুরী। তারপর গেলুম গোপালপুর। দুটি ছেলে সমুদ্রে সাঁতার কাটছিলো। স্বাস্থ্য-সম্পন্ন দুটি ছেলে। সাঁতার কাটতে কাটতে একজন অজ্ঞান হয়ে গেল। ওকে যখন জল থেকে টেনে হিঁচড়ে ডাঙায় তোলা হল তখন এক বীভৎস দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা গেল। ছেলেটিকে যখন ডাঙ্গায় তোলা হল তখন দেখা গেল জলের নিচে থাকাকালীন হিংস্র হাঙ্গর ওর পা দুটো কেটে নিয়ে গেছে। অত্যধিক রক্তক্ষরণে ছেলেটিকে ডাঙ্গায় তুলতেই সে অজ্ঞান হয়ে গেল।

গোপালপুরে ছেলেটির সঙ্গে হোটেলে আমার আলাপ হয়েছিলো। একটি মেয়েকে সে ভালোবাসতো। তার সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়েছিলো। বিয়ের নিমন্ত্রণ চিঠি আমাকে দেখিয়েছিলো। আমাকে একটি চিঠি দিয়ে সে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলো। কলকাতায় ওর বিয়ে হবার কথা ছিল। ছেলেটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। সেখান থেকে বিশেষ বন্দোবস্ত করে ভুবনেশ্বর। ভালো লাগে নি সমুদ্র সৈকত। গোপালপুর। পুরী। কোনো সমুদ্র সৈকতই আর ভালো লাগে নি। ছেলেটি সুদর্শন ছিল।

তার কথাগুলো আমার কানে ভাসতো। এখানটায় মাছের কি আঁশটে গন্ধ। ঐ দেখুন মাছের সারি দেওয়া চুবড়ি। ঐ দেখুন তন্তু জাল। কি ভীতু আপনি। সমুদ্রে স্নান করতে এতো ভয় আপনার। আচ্ছা আজ এসব থাক। আপনি আমার ভাবী বউ-এর গল্প শুনতে ভালবাসেন। ওর সম্বন্ধে আজ আবার কিছু বলছি। অনেকদিন পরে ছেলেটির সঙ্গে কলকাতায় হঠাৎ দেখা। ক্রাচে ভর করে সে তখন চলাফেরা করে। ও যাকে বিয়ে করবে বলে ঠিক করেছিল তার ততোদিনে অন্যখানে বিয়ে হয়ে গেছে। স্বামী স্ত্রী ওকে একদিন দেখতে এসেছিলো। এর পরে সমুদ্রসৈকত কার ভালো লাগে। প্রেমের গল্প পড়তে মন মোটেও রাজী হয় না। ছেলেটির সঙ্গে মেয়েটির প্রেম হয়েছিলো।

আমি ভাবি পঙ্গু ছেলেটিকে বিয়ে করলে মেয়েটির এমন কি ক্ষতি হতো। সিমিলি পালের জঙ্গল থেকে কুড়িয়ে পাওয়া ছোট্ট ব্যাঘ্র ছানাটিকে অতি যত্নে বড়ো করে তুলেছিলো মিস্টার রায়চৌধুরী। আমার বন্ধু তুহিন পাণ্ডা খৈরীকে দেখে এসে বাঘটি সম্বন্ধে আমার কাছে অনেক গল্প করেছিলো। ভুবনেশ্বরের কাছে নন্দনকাননের বাঘটার গল্প কম থ্রিলিং নয়। সঙ্গিনার খোঁজে বাঘটা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে চিড়িয়াখানার আশেপাশে ঘুরে বেড়াতো। বন্দিনী বাঘিনীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে অস্থির হতো। ঘন ঘন ডাঁক ছাড়তো। তারপর একদিন অস্থির হয়ে চঞ্চল হয়ে চিড়িয়াখানার বেড়া টপকিয়ে বাধা ডিঙিয়ে উপস্থিত হল চিড়িয়াখানার ভেতর। স্বইচ্ছায় বন্দী হল। মিলিত হতে চাইলো প্রেমিকার সঙ্গে। জন্তুর প্রেম কম মাহাত্ম্যপূর্ণ নয়। ঘুরতে ঘুরতে গিয়েছিলাম গঞ্জামের তপ্ত পানি আর ভুবনেশ্বর থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে আটরির উষ্ণ প্রস্রবন দেখতে। এর আগে দেখেছিলাম রাজগীরের আর বক্রেশ্বরের উষ্ণ প্রস্রবন। চেকোশ্লোভাকিয়ার সম্রাট চতুর্থ চার্লসের শিকারের উদ্দেশ্যে তৈরি ঘরে একবার চার্লসের শিকারী কুকুর চিৎকার করতে করতে ছুটে এলো। দেখা গেল কুকুরের শরীর ভেজা। জায়গায় জায়গায় ফোস্কা পড়েছে। উষ্ণ প্রস্রবনে ছিল খনিজ পদার্থ এবং

তেজস্ক্রিয় গ্যাস। রাজগীর আর উড়িষ্যার কুণ্ডের আশে পাশে প্রচুর ভীড়। ছিল কথকতা আর ঢপ কীর্তনের ব্যবস্থা।

রাজগীরের কুণ্ডের কাছাকাছি অঞ্চলে নন্দাকে নাচ গান করতে দেখে-ছিলাম। কী নাচ। কী নাচ। ঘুরে ঘুরে নাচ। সঙ্গে ঢোল আর তবলা বাজতো। শুনেছিলাম নন্দার বিয়ে হয় নি। কিন্তু তার সঙ্গে বেশ কয়েকটি বাচ্চাকে দেখেছি। কৌতূহল হয়েছিল নন্দাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম— ও বাচ্চাটা কার?

—কেন আমার। ঠোঁট টিপে টিপে হাসে নন্দা।

—ঠাট্টা করছো?

—কেন আমার বাচ্চা হওয়া বারণ নাকি। তোমার বিয়ে হয় নি। আমার মন বলছে এ বাচ্চাগুলো তোমার নয়।

—ভগবান আমার হাতে যখন তুলে দিয়েছেন, তখন আমারই বাচ্চা। নন্দার মুখে চোখে মাতৃত্বের উজ্জ্বল আভা।—ঠিকঠাক করে সব কিছু বল দিকিন।—বুঝতেই তো পারছো সব কিছু। বড় ঘরের ব্যাপার। ওদের সখ আহ্লাদ যখন সরমের বাত হয়েছে তখুনি আমার হাতে তুলে দিয়েছে। আমার বাচ্চা বলে চালাতে হয়েছে। পর পর চারটে বাচ্চা আমার কাছে চলে এসেছে। আর ওদের মানুষ করে তোলবার জন্যেই এ নাচগান। ওদেরকেই আমি নিজের বাচ্চা বলে মনে করি। নন্দার মুখখানাতে যেন স্বর্গের আভা ফুটে উঠেছে। আমি ভাবি কুণ্ডের জল বুঝি এদের স্পর্শে অপবিত্র না হয়ে আরো অনেক বেশী পবিত্র হয়ে উঠেছে। গঞ্জামের তপ্তপানির কাছে মা ও মেয়েকে দেখেছিলাম। মেয়ের চর্মরোগে সমস্ত দেহ সাদা হয়ে গেছে। মা মেয়েকে চর্মরোগ নিবারণের জন্যে কুণ্ডের জলে স্নান করতে বলছে। মেয়ে কিছুতেই স্নান করবে না। এই নিয়ে মা মেয়েতে প্রচণ্ড ঝগড়া। নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে ওরা এসেছে। একটু খোঁজ খবর নিয়ে যা জানলাম তাতে জানতে পারলাম মেয়ের একসময় গায়ের রঙ মিশমিশে কালো ছিল। তারপর নাক চোখ মুখ ভালো নয়। বেশ কয়েকটা বিয়ের সম্বন্ধ ভেস্তে গেছে।

এরপর মেয়েকে ধরলো এই রোগ। দেহ ধীরে ধীরে সাদা হয়ে গেল। এক নজর দেখলেই বোঝা যায় যে এ রঙ স্বাভাবিক নয়। কিন্তু মেয়ে মোটেও অখুশী নয়। দেহের ওই শ্বেতবর্ণ তার গর্ব। হোকনা রোগ। তবুও কালো রঙের বিরুদ্ধে এ এক বিরাট অভিযান। শুধু অভিযানই নয়। রীতিমতো জয়। আমি অনুমান করেছিলাম যে মেয়েটি নিভৃতে নির্জনে জয়ের উল্লাসে ক্ষণে ক্ষণে সগর্বে হেসে উঠছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বোধ করি তার চোখের কোণে অশ্রুজল চিক চিক করে ওঠে। তাই মা মেয়েকে কুণ্ডে অবগাহন করতে বললেও মেয়ে রাজী নয়। তার রোগ যদি সত্যি সত্যি সেরে যায়। তার পূর্বের কালো রঙ দেহে যদি আবার স্থায়ী আসন পেতে বসে। সে কালো রঙের মেয়ে বলে আর পরিচিত হতে চায় না। কি বিচিত্র এ পৃথিবী।

এক হাজার এক'শ স্কোয়ার কিলোমিটার বিস্তৃত জলরাশি যার নাম চিল্কা হ্রদ। চিল্কায় রম্ভার ট্যুরিস্ট বাংলোতে আলাপ হয়েছিলো প্রফেসর ঘোড়পাড়ের সঙ্গে। পাখী বিশারদ। পাখীর পেছনেই জীবনটা কাটিয়েছে। শীতের সঙ্গে দেশ বিদেশ থেকে হাজার হাজার পাখী উড়ে এসেছে। আর ঘোড়পাড়ে ব্যস্ত তাদের নিয়ে। গত বছর পাখীদের পায়ে আংটি পরিয়ে তাদের ঘোড়পাড়ে ছেড়ে দিয়েছিল। এবারকার শীতে তাদের ভেতর কজন ফিরে এলো সেই নিয়ে ঘোড়পাড়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছে। পাখী অন্ত প্রাণ ঘোড়পাড়ের। বউ থেকেও সে পাখীকে বেশী ভালবাসতো। একদিন তার বউ তারই এ্যাসিসটেন্টের সঙ্গে পালালো। পরমা সুন্দরী ছিল ঘোড়পাড়ের স্ত্রী। তাকে ছেড়ে চলে যাবার আগে এক প্রহসনের অবতারণা করলে ঘোড়পাড়ের স্ত্রী। একটা খাঁচায় কয়েকটা পাখী আবদ্ধ ছিল। কিছু পাখী বহু দূর দেশ থেকে উড়ে এসেছিলো। তাদের পায়ের আংটি পরীক্ষা করবার জন্যে—ঘোড়পাড়ে তাদের খাঁচার ভেতর পুরে রেখেছিলো। গত বছর শীতে পাখীগুলোকে আংটি পরিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছিলো। প্রথম পাখীর পায়ের আংটির সঙ্গে ছোট্ট তামার পাতের ভেতর ছোট্ট এক টুকরো কাগজ আটকানো

ছিল । সেটা খুলে পড়তেই ঘোড়পাড়ের মাথা ঘুরে গেল । ঘোড়-পাড়ের স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে যাবার আগে চিঠি লিখে রেখে গেছে ।
ঘোড়পাড়ে সব কিছু জানতে পারলে । কয়েক রাত ঘোরপাড়ে ঘুমুতে পারে নি । পরে অনেকগুলো ঘুমের বড়ি খেয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়ে-ছিলো ঘোড়পাড়ে । কিন্তু শেষ পর্যন্ত মরলো না সে । ডাক্তাররা তাকে বাঁচিয়ে তুললে । আর তখন থেকে ঘোড়পাড়ে কি রকম আধ-পাগলাটে হয়ে বেঁচে রইলো । পাখীর নেশা তার হাজারোগুণ বেড়ে গেল । প্রতি শীতের মরশুমে তার একবার চিল্কা হ্রদে আসা চাই । পাখীর লোভে না বউএর স্মৃতিটুকু ঝালিয়ে নিতে তা কেউ বলতে পারে না ।

এ গল্পটা শুনেছিলাম নকুলেশ্বর পট্টনায়েকের কাছে । নকুলেশ্বর সাং-বাদিক । সে এসেছিলো অসুরগড় দুর্গের খোঁজ খবর নিতে । তার পত্রিকায় অসুরগড় দুর্গ কাহিনী ছাপবার বাসনা তার অনেক দিনের। অসুরগড় দুর্গ উড়িষ্যার কালাহাণ্ডি ডিস্ট্রিক্টে । সম্প্রতিকালে এর খনন কার্য চলছিলো । বহু পুরনো, ভাঙা, জীর্ণ, মাটির নিচে চলে যাওয়া অসুরগড় দুর্গ, উড়িষ্যার পুরোনো ইতিহাস সংস্কৃতির ওপর সম্ভাবনাপূর্ণ আলোকপাত করবে বলেই ছিল সকলের বিশ্বাস । তাই এতো পরিশ্রম এতো মেহনত ।

অসুরগড়ে খনন কার্য চলেছিলো অনেকদিন থেকেই। পুরনো কালের বহু ঐতিহ্যপূর্ণ বস্তুই ওখানে পাওয়া গেছে । পাওয়া গেছে রূপো এবং তামার মুদ্রা । মাঝে মাঝেই দেখা গেছে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে মাটি ধুয়ে সাফ হয়ে রৌপ্য মুদ্রা বেরিয়ে পড়েছে। ১৯৫৮ সালে ৫৩৯টি রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গিয়েছিলো । পণ্ডিত এবং ঐতিহাসিকদের ধারণা পঞ্চম শতাব্দীতে এ সব রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত ছিল ।

অসুরগড়ের খননকার্য খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টজন্মের পরবর্তী পঞ্চম শতাব্দীর সভ্যতার ওপর আলোকপাত করেছিলো । এসবই শুনিয়েছিলো নকুলেশ্বর পট্টনায়েক। তার ইতিহাসের ওপর প্রচণ্ড দখল । ও বলেছিলো যে মহাভারতের সময় অসুরগড় দুর্গের আশপাশ

অঞ্চল থেকে কলিঙ্গ রাজ্যের রাজারা তাদের সৈন্য-সামন্ত সংগ্রহ করতেন। নকুলেশ্বর পট্টনায়েক বলেছিলো যে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে খ্রীষ্ট জন্মের পর ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত অসুরগড় স্ব-মহিমায় বিরাজমান ছিল। অসুরগড়ের প্রচণ্ড নামডাক ছিল। খ্রীষ্ট জন্মের পর চতুর্থ শতাব্দীতে অসুর গড় নাকি রাজা ব্যাঘ্র রাজের অধীনে ছিল। ঐতিহাসিকের মতে সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত তার দাক্ষিণাত্য অভিযান কালে এই ব্যাঘ্ররাজকে পরাজিত করেছিলেন।

এই কালাহাণ্ডি অরণ্যে নকুলেশ্বর পট্টনায়ক আর তার দুই বন্ধুর সাক্ষাৎ হয়েছিলো গুরুদাস মানসিংহের সঙ্গে। হাসিখুশী মানুষ। স্থানীয় জোত-দার। ছ ফুট দীর্ঘ দেহধারী পুরুষ। যখন হাসতো ঘর কাঁপতো থরথর করে। রাগ হলে মেঘ গর্জন হত ! দোষীর হার্টফেল করার উপক্রম হত। কিন্তু লোকটি বন্ধুবৎসল ছিল। পরোপকারী সজ্জন ব্যক্তি। গরীবদুঃখীর ব্যথা বেদনা বুঝতো। সাহায্য করতে চেষ্টা করতো। ভোজন বিলাসী পুরুষ। পান এবং আহারে কোনো কার্পণ্য বা অনিচ্ছা প্রকাশ করে নি কোনো দিন। কিন্তু ভীষণ জেদী ছিল লোকটি। খানিকটা ভাবপ্রবণ। খেয়াল খুশী মতো চলতো। যখন যা মনে হত সেটা চরিতার্থ করতে সময় নিতো না মোটেও গুরুদাস মানসিংহ নকুলেশ্বর পট্টনায়ক ও তার সঙ্গীদের সঙ্গে শিকারে বেরিয়েছিলো। হঠাৎ সামনে একপাল হরিণ। কিন্তু সময় মতো হাতের কাছে বন্দুক যোগাতে পারলে না বানেশ্বর পূজারী। ব্যস্। আর যায় কোথায়। চাবুক দিয়ে চাবকাতে চাবকাতে ওর পিঠের অর্ধেক ছাল তুলে ফেললো মানসিংহ। কিন্তু তার পর ডাক্তার আনতে লোক ছুটলো। ডাক্তারকে ঘুষ এক হাজার টাকা। বানেশ্বর পূজারী পেলো দু হাজার টাকা। তার স্ত্রী ছেলেমেয়ে আরো দু হাজার টাকা। আধ ঘণ্টা শিকারে এই পাঁচ হাজার টাকা। আর পান ভোজনে আরো হাজার পাঁচেক টাকা খরচ হল। মানসিংহ হেসে বলেছিলো—'বানেশ্বর পূজারীকে হাজার চারেক টাকা দেবার ইচ্ছে অনেকদিন থেকে ছিল। একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। সুযোগ

মিলে গেলো। পূজারী টাকা পেয়ে গেল এমনি এমনি টাকা দিতে আমার কেমন সঙ্কোচে বাধে। এর পর নকুলেশ্বর পট্টনায়ক এবং তার সাথী সঙ্গীর আদর আপ্যায়ন চললো। কিছুরই অভাব নেই। ভোজ। সুরা। নাচগান। হৈ হুল্লোড়, রূপসী নারী, রাতভর জলসা। নকুলেশ্বর পট্টনায়েক এবং সঙ্গীরা যখন আনন্দের ভেতর ডুবে মরছে তখনি গভীর রাতে বাড়িতে ডাকাত পড়লো। কিছু লুটপাট হল। দড়ি দিয়ে লোক-গুলোকে বাঁধা হল। জোতদার মানসিংহের ওপব ডাকাত সর্দারের খুব আক্রোশ নেই বলে মনে হল। যতো আক্রোশ ওই নকুলেশ্বর পট্টনায়ক আর তার সঙ্গীদের ওপর। নকুলেশ্বর একটা মেয়েকে নিয়ে স্ফূর্তি করেছে যার ওপর অধিকার ছিল ডাকাত সর্দারের।

তার মেয়ের গায়ে হাত। ডাকাত সর্দার ক্ষিপ্ত। প্রায় উন্মত্ত। রামদায়ের কোপে তখুনি নকুলেশ্বর পট্টনায়ককে কেটে ফেলে প্রায়। নকুলেশ্বর পট্টনায়ক ও তার সাথী-সঙ্গীর লাঞ্ছনার আর সীমা পরিসীমা রইলো না। মদ দিয়ে তাদের স্নান করানো হল। জামাকাপড় আগেই ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছিলো। মাঝে মাঝে ভয় দেখানো হল। রাত ভোর পর্যন্ত ডাকাতদের হুমকী আর দাপট চললো। ওদের নাকে মুখে চুনকালি আগেই মাখানো হয়েছিলো। যাক ভোরের দিকে ওদের মুক্তি মিললো। রজ্জুবন্ধন থেকে ওরা মুক্তি পেলো। ফেরত পেলো কাপড় চোপড়। গরম জল দিয়ে ওদের সর্বাঙ্গ ধুইয়ে দেওয়া হল। ডাকাতেরা বিদায় নিলো। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো নকুলেশ্বর পট্টনায়ক আর তার চেলা-চামুণ্ডারা। এদিকে গুরুদাস মানসিংহ হেসে মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। সমস্ত ব্যাপারটাই ভূয়ো। সাজানো। মানসিংহের নির্দেশে মানসিংহের লোকেরা ডাকাত সেজে ছিল। চটক আর রগড়ের জন্যে এতোখানি মিথ্যার আয়োজন। রাত বারোটার পর পয়লা এপ্রিলের শুরু। তাই মানসিংহের এতোটা ছেলেমানুষী। তাকে মিথ্যার পাহাড় সাজাতে হয়েছে। খানিকটা মজা লুটবার জন্যে এতোখানি মেহনত। এতোটা দুর্ভোগ নকুলেশ্বর আর তার সাঙ্গোপাঙ্গোর কপালে লেখা ছিল। শোনা যায়

মানসিংহের বাঁপ ঠাকুরর্দার রক্তে পাগলামীর বীজ ছিল। রোগটা এসে-
ছিল খারাপ রোগ থেকে। মনে হয় পাগলামীর বীজ মানসিংহের রক্তেও
ছিল। নকুলেশ্বর পট্টনায়ক আর কখনো ওমুখো হয় নি।

———